রোহিঙ্গা নিধন : একটি বিশ্লেষণ

মোশাহিদা সুলতানা

রোহিঙ্গা নিধনযজ্ঞের ফলে রাষ্ট্রহারা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখোমুখি একটি পুরো জাতি। তার সাথে বাংলাদেশও এক কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি। এই পরিস্থিতি দাবি করে এই জাতিগত নির্মূল অভিযানের সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ঐতিহাসিক কার্যকারণ অনুসন্ধান। এই লেখায় সেই বিশ্লেষণই হাজির করা হয়েছে।

এ বছর ২৫ আগস্ট থেকে মিয়ানমারের মিলিটারি কর্তৃক রোহিঙ্গাদের ওপর বর্বরোচিত গণহত্যা শুরু হয়। এর পর থেকে জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী প্রায় ৬ লাখ রোহিঙ্গা মিয়ানমার সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে এসে আশ্রয় নেয়। এই বিপুলসংখ্যক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী বাংলাদেশে আসার পর তাদের দেয়া বয়ানের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি কী নির্মম হত্যাকাণ্ড, ধর্ষণ, বাড়িঘর পোড়ানো, এবং শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়ে তারা পালিয়ে এসেছে দীর্ঘ পথ হেঁটে, নৌকায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, বৈরী আবহাওয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে। তাদের মধ্যে অনেকে সীমান্তে এসে বাধার সম্মুখীন হয়ে দিনের পর দিন অপেক্ষা করেছেন, আবার অনেকে বাংলাদেশে প্রবেশ করেও তীব্র খাবার সংকটে, পানির সংকটে পড়ে রোগে-শোকে ভুগে মানবেতর জীবন যাপন করছেন। এ রকম একটা পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই মিয়ানমারে রোহিঙ্গা নিপীড়নের ইতিহাস, তার কার্যকারণ, রোহিঙ্গাদের পরিচয়, জাতীয়তা ইত্যাদি নিয়ে বাংলাদেশসহ বিশ্বজুড়ে চলছে নানা আলোচনা, বিশ্লেষণ, তর্ক-বিতর্ক।

এসব আলোচনা, প্রশ্ন ও তর্ক-বিতর্কের মধ্যে রয়েছে, মিয়ানমার কেন ঐতিহাসিকভাবে রোহিঙ্গাদের বাঙালি দাবি করে তাদের ওপর জাতিগত নিধন চালিয়ে এসেছে এতদিন? আসলেই কি তারা বাঙালি, নাকি তাদের নিজস্ব আত্মপরিচয় রয়েছে, যা মিয়ানমার অস্বীকার করে চলেছে? রোহিঙ্গাদের ওপর নিপীড়নের পেছনে কি কোনো রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কারণ রয়েছে, নাকি একে শুধু জাতিগত ঘৃণার জায়গা থেকে দেখা উচিত? অং সান সু চি কি সত্যি সত্যি মিয়ানমারের মিলিটারির হাতের পুতুল, নাকি তিনি তাঁর জনসমর্থন কাজে লাগিয়ে রোহিঙ্গাদের পক্ষে জনমত গড়ার ক্ষমতা অর্জন করা সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃতভাবে তা ব্যবহার করছেন না? আসলে কি গণহত্যা চলছে, নাকি গণহত্যা কিছু অত্যুৎসাহী মানবতাবাদীর বিশ্বদরবারে একটি মনগড়া নালিশ? যদি মন্থর গণহত্যাই হয়ে থাকে তাহলে কিসের ভিত্তিতে একে মন্থর গণহত্যা বলা হচ্ছে? গণহত্যা মন্থর হলেই কি শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য করা হবে না? আর গণহত্যা হয়েছে কি না তার প্রমাণের অপেক্ষায় আন্তর্জাতিক আদালতের দিকে তাকিয়ে থাকব, নাকি দাবি তুলব যে কোনো জাতিগত নিধন হোক আর গণহত্যা হোক, দন্ডনীয় শাস্তির বিধান থাকতে হবে উভয় ক্ষেত্রেই?

২.

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আমাদের চারদিকে প্রাপ্ত তথ্য, ইতিহাস সম্পর্কিত জ্ঞান এবং মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিচার-বিবেচনাভেদে একেকজনের কাছে একেক রকম। এই প্রবন্ধে উত্তরগুলো অনুসন্ধানের দিকনির্দেশনা হিসেবে কিছু তথ্য-উপাত্ত বিশেষণ ও পর্যালোচনা করা হবে। দীর্ঘদিন ধরে মিয়ানমারের মতো একটি দেশ, যার সীমানার ভেতর ১৩৫টিরও বেশি জাতিগোষ্ঠী বসবাসের নজির পাওয়া গেছে, যেখানে ১৯৪৮ সালে সীমানা নির্ধারণের আগে বিপুল অভিবাসনের ইতিহাস তৈরি হয়ে গেছে এবং যেখানে পরবর্তীতে জাতি পরিচয় অভ্যন্তরীণ রাজনীতি নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে, সেই দেশের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনার কার্যকারণ ও ভবিষ্যৎ একটি প্রবন্ধের মাধ্যমে তুলে ধরা একেবারেই অসম্ভব। তাই এই প্রবন্ধ কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের মধ্যে সীমিত থেকে একটি বিশ্লেষণ হাজির করেছে।

প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন, এই লেখাটি লিখতে গিয়ে রোহিঙ্গাদের সাথে সম্পর্কিত মিয়ানমারের রাজনৈতিক ইতিহাস বিষয়ে যেসব বই পড়েছি, তাতে একটি ধারণা প্রকট হয়েছে তা হলো এই ইতিহাসের অনেকগুলো বয়ান আছে, যাদের কিছু অংশে মৌলিক কিছু মিল রয়েছে, আবার কিছু অংশ একেবারেই ভিন্ন। কিছু বই রোহিঙ্গাদের জীবন নিয়ে প্রাসঙ্গিক কিছু ঘটনাকে একেবারেই উল্লেখ করেনি, আবার অন্য কোনো বই এক দিক উন্মোচন করতে গিয়ে অন্য দিকে অস্পষ্টতা রেখেছে। ইতিহাসের বিভিন্ন বয়ানের এই বাস্তবতা শুধু মিয়ানমারের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, ইতিহাস নিয়ে এ রকম ভিন্নমতাদর্শী লেখা সারা পৃথিবীতেই রয়েছে। আমি মনে করছি, মানবতার এই সংকটপূর্ণ মুহূর্তে ইতিহাসের কোন বয়ান শুদ্ধ আর কোন বয়ান অসম্পূর্ণ–এই প্রসঙ্গে না গিয়ে বরং সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো ঘটার পেছনে কারণ অনুসন্ধান করলে অসম্পূর্ণ হলেও একটি আংশিক বিশ্লেষণ হাজির করা যাবে। আর ঐতিহাসিক ও সাম্প্রতিক কিছু ঘটনার ভিত্তিতে উপরোল্লিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা যেতে পারে।

৩.

রোহিঙ্গারা রাষ্ট্রহীন কেন? মিয়ানমার কেন ঐতিহাসিকভাবে রোহিঙ্গাদের বাঙালি হিসেবে দাবি করে তাদের ওপর জাতিগত নিধন চালিয়ে আসছে? জাতিবিদ্বেষের উৎস কী? রোহিঙ্গারা কত আগে থেকে আরাকানে বসবাস করে আসছিল, এ প্রসঙ্গে অনেক তথ্য-উপাত্ত রয়েছে ইতিহাসের বইয়ে। অনেক ক্ষেত্রে এইসব তথ্য একে অপরের সাথে সাংঘর্ষিক এই অর্থে যে কিছু কিছু বয়ান থেকে আমরা জানতে পারি রোহিঙ্গা শব্দটি ব্যবহার করা শুরু হয়েছে ১৯৪৮-এর পর, আবার কিছু ঐতিহাসিক রোহিঙ্গাদের আরাকানে বসবাসের ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে দাবি করেছেন, আরো হাজার বছর আগে আরাকানে মুসলিমদের অস্তিত্ব ছিল এবং তাদের সাথে রোহিঙ্গা জাতি গোষ্ঠীর উৎসের সম্পর্ক রয়েছে। এই প্রসঙ্গে না গিয়েও ১৯৪৮ সালে রোহিঙ্গাদের কেন ১৩৫টি নৃগোষ্ঠীর মতো আলাদা একটি জাতি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হলো, ১৯৭৪ সালে কেন জরুরি অভিবাসী আইনের মাধ্যমে এই স্বীকৃতি কেড়ে নেয়া হলো, এবং কেন ১৯৮২ সালের সংবিধানে রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্বকে অস্বীকার করা হলো–এই তিনটি প্রশ্নের পর্যালোচনা

করলেই বোঝা যায়, রোহিঙ্গাদের কাঠামোগতভাবে রাষ্ট্রবিহীন করে রাখার কারণ খুঁজতে গেলে রোহিঙ্গাদের জাতিগত-ইতিহাসের বয়ানের দ্বন্দ্ব নিরসনের চেয়ে বেশি প্রয়োজন হয় মিয়ানমারের পরিচয়ের রাজনীতির ইতিহাস এবং জাতিগত ঘৃণার উৎস অনুসন্ধানের।

১৯৪৮ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী উ নু এবং প্রেসিডেন্ট সাও শোয়ে থাইকে রাজনৈতিক কৌশলের অংশ হিসেবে রোহিঙ্গাদের একটি নৃগোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃতি[১] দিয়েছিল। (Lwin, 2012) ১৯৬২ থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকা নে উইন সরকার ১৯৭৪ সালে জরুরি অভিবাসী আইনের মাধ্যমে এই স্বীকৃতি কেড়ে নেন। এই জরুরি অভিবাসন আইন পাসের আগে ১৯৬৪ সালে নে উইন একটি জরিপ চালিয়েছিলেন বলে জানা যায়। সেই জরিপে দেখানো হয়েছিল, রাখাইন থেকে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষ অন্য শহরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ততদিনে অভিবাসন করে ফেলেছে। এই জরিপটি আদৌ ঠিকমতো করা হয়েছিল কি না তা নিয়ে অনেকের মনেই সন্দেহ রয়েছে। তবে ধারণা করা হয়, জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে অনাকাঙ্ক্ষিত অভিবাসনের প্রবণতা লক্ষ করার অজুহাত দেখিয়ে ভবিষ্যতে আরাকানের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষদের ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা কঠিন হবে–এই শঙ্কা পোষণ করে নে উইন ঘোষণা দেন, উত্তর রাখাইন থেকে শুরু করে আকিয়াবের পূর্ব দিক পর্যন্ত এলাকায় বসবাসরত কেউ অনুমতি ছাড়া অন্য কোনো শহরে অভিবাসন করতে পারবে না। এমনকি এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামেও যেতে পারবে না। (Scholnthal, Benjamin 2016: P 262)

পরবর্তীতে ১৯৮২ সালে মিয়ানমারের সংবিধান প্রণয়ন করে রোহিঙ্গাদের পূর্ণ নাগরিকত্ব লাভের পথ বন্ধ করে দেয়া হয়। এই পরিবর্তিত সংবিধানে ১৮২৪ সালের পরে আসা বর্মী নয় এমন মানুষদের নাগরিক হিসেবে পূর্ণ স্বীকৃতি দেয়া থেকে বঞ্চিত করা শুরু করে। এখানে উল্লেখ্য, ১৯৮২ সালে যে ১৩৫টি নৃগোষ্ঠীর স্বীকৃতির কথা সংবিধানে উল্লেখ করা হয় তাদের তালিকা সংবিধান পরিবর্তনের পর ১৯৮৩ সালে করা হয়েছিল। এর পূর্বে নৃগোষ্ঠী তালিকাভুক্ত করতে গিয়ে ১৯৩১ সালে ১৩৯টি নৃগোষ্ঠী পাওয়া গিয়েছিল, আবার জেনারেল নে উইনের শাসনামলে (১৯৬২-৮৮) ১৪৪টি নৃগোষ্ঠীর অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছিল। (Wade, 2017) অর্থাৎ নৃগোষ্ঠীর তালিকাভুক্ত করতে গিয়ে কয়টির আসলে অস্তিত্ব ছিল তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল রাজনৈতিক বিবেচনায় স্বীকৃতি দেয়া।

ইউএন চার্টার (UN Charter) অনুযায়ী কোনো রাষ্ট্রহীন (কোনো দেশেরই নাগরিকত্ব নেই) অভিভাবক যদি এমন কোনো দেশে সন্তান জন্মদান করেন, সেই দেশ তার নিজ দেশে জন্মগ্রহণ করা শিশুকে রাষ্ট্রহীন করে রাখতে পারে না। তাকে জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব দিতে হবে। ইউএন চার্টার অনুসরণ করলে রোহিঙ্গাদের এমনিতেই জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব পাবার কথা। তাহলে মিয়ানমারের ক্ষেত্রে রোহিঙ্গাদের রাষ্ট্রহীন করে রাখা হলো কেন?

১৯৮২ সালের এই বিতর্কিত সংবিধান পরিবর্তন থেকে একটা প্রশ্ন প্রকট হয়ে ওঠে–১৮২৪ সালের আগে ও পরে ঠিক কী হয়েছিল, যে কারণে বার্মিজ সরকার ১৮২৪ সালকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় হিসেবে বিবেচনা করল? এবং এক্ষেত্রে কেন বিবেচনা করল না যে যুগ যুগ ধরে বসবাস করলেও তাদের সকলের কাছে সরকারের স্বীকৃত দলিলপত্র না-ও থাকতে পারে। এখানেই প্রশ্ন আসে, ১৯৮২ সালে এসে কেন ১৬০ বছর আগের পূর্বপুরুষের বসবাসের দলিল প্রমাণ হিসেবে হাজির করতে হবে পূর্ণ নাগরিকত্ব অর্জন করতে হলে? ইউএন চার্টার (UN Charter) অনুযায়ী কোনো রাষ্ট্রহীন (কোনো দেশেরই নাগরিকত্ব নেই) অভিভাবক যদি এমন কোনো দেশে সন্তান জন্মদান করেন, সেই দেশ তাঁর নিজ দেশে জন্মগ্রহণ করা শিশুকে রাষ্ট্রহীন করে রাখতে পারে না। তাকে জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব দিতে হবে। ইউএন চার্টার অনুসরণ করলে রোহিঙ্গাদের এমনিতেই জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব পাবার কথা। তাহলে মিয়ানমারের ক্ষেত্রে রোহিঙ্গাদের রাষ্ট্রহীন করে রাখা হলো কেন?

১৮২৪ থেকে আরাকান দখলের চেষ্টার পর ১৮২৬ সালে ব্রিটিশরা আরাকান দখল করে। দখলের প্রাক্কালে ব্রিটিশ কলোনিয়াল অফিসে কর্মরত চার্লস প্যাটন ব্রিটেনের গুপ্তচর সংস্থার জন্য বার্মার আরাকানে একটি জনসংখ্যা জরিপ (১৮২৫-২৬) করে। সেই জরিপে নৃগোষ্ঠী পরিচয়কে প্রাধান্য না দিয়ে প্রাধান্য দেয়া হয় ধর্ম পরিচয়কে। জরিপে দেখা যায়, তখন আরাকানে বসবাসরত রাখাইন বৌদ্ধ ছিল ৬০ হাজার, মুসলিম ৩০ হাজার এবং অন্যান্য নৃগোষ্ঠী ১০ হাজার। (Ibrahim, 2016) এর ফলস্বরূপ আমরা দেখি, রোহিঙ্গা শব্দটি আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যবহার করা হয়নি, যদিও রোহিঙ্গারা সেখানে বসবাস করত। রোহিঙ্গারা যে বার্মায় আরো আগে থেকেই বসবাস করত তার প্রমাণ পাওয়া যায় আরো অনেক সূত্র থেকে। তার মধ্যে একটি বহুল আলোচিত তথ্য রয়েছে ১৭৯৯ সালে প্রকাশিত ফ্রান্সিস বুকাননের বইয়ে। সেখানে তিনি উলেখ করেছিলেন, আরাকানে দুই ধরনের জনগোষ্ঠী রয়েছে–ইয়াকাইন (রাখাইন) ও রুইঙ্গ্যা (রোহিঙ্গা)।

I shall now add three dialects, spoken in the Burma Empire, but evidently derived from the language of the Hindu nation. The first is that spoken by the Mohammedans, who have long settled in Arakan, and who call themselves Rooinga, or natives of Arakan. (Buchanan. 1799)

১. The parliamentary government (1948-1962) had officially declared Rohingya as one of the indigenous ethnic groups of Burma. The declaration reads: `The people living in Mungdaw and Buthidaung regions are our national brethren. They are called Rohingya. They are on the same par in status of nationality with Kachin, Kayah, Karen, Mon, Rakhine, and Shan. They are one of the ethnic races of Burma. (Radio speech by Prime Minister U Nu, 25 September 1954 at 8:00 PM. উ নু সরকারের সময় এবং পরবর্তীতেও দেখা গেছে রোহিঙ্গারা জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। রোহিঙ্গাদের ভোট দেয়ার ক্ষমতাও ছিল। ১৯৪৭ সালের সংবিধান অনুসারে `…citizens are required to obtain a national registration card, while non-nationals are given a foreign registration certificate (FRC) রোহিঙ্গাদের যেহেতু ন্যাশনাল রেজিস্ট্রেশন কার্ডও ছিল, তাই বলা যায় এই সরকারের সময় ১৩৫টি জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে রোহিঙ্গা হিসেবে স্বীকৃতি না পেলেও রোহিঙ্গাদের অন্যভাবে কিছু স্বীকৃতি ছিল। ১৯৪৮ সালে যে নাগরিকত্ব আইন করা হয় সেখানে লেখা ছিল `For the Purposes of section 11 of the Constitution the expression any of the indigenous races of Burma shall mean Arakanese, Burmese, Chin, Kachin, Karen, Kayah, Mon or Shan race and such racial group as has settled in any of the territories included within the Union as their permanent home from a period anterior to 1823 A.D (1185 B. E) এখানে উলেখ্য, রোহিঙ্গারা 'আরাকানের মুসলিম' হিসেবে সংজ্ঞায়িত হয়। এই পরিচয় রোহিঙ্গা নৃগোষ্ঠী হিসেবে নয়, বরং ধর্ম ও বাসস্থল দ্বারা নির্ধারিত পরিচয়ের ভিত্তিতে সংজ্ঞায়িত হয়েছে। আর এখানেই সমস্যার উৎপত্তি, যা পরবর্তীতে কাজে লাগিয়ে ১৯৮২ সালে একটি জাতিগোষ্ঠী হিসেবে সম্পূর্ণরূপে রোহিঙ্গাদের রাষ্ট্রহীন করে দেয়া হয়। তাই পরবর্তীতে দেখা যায়, কফি আনান কমিশন ও রাখাইন কমিশনের যৌথ রিপোর্ট অনুসারে `Over the decades since independence, successive governments have adopted legal and administrative measures that progressively eroded the political and civil rights of the Muslim communities in Rakhine State. Prior to the military coup in 1962, the community enjoyed some degree of recognition, and was for a short while allotted a designated administrative area in Northern Rakhine.' (Page, 29, Final Report of The Advisory Commission on Rakhine State, August 2017)

তাছাড়া ১৮১১ সালের ক্লাসিক্যাল জার্নাল বার্মায় প্রচলিত তিনটি ভাষার উল্লেখ করতে গিয়ে 'রুইঙ্গা' ভাষাকে অন্যতম ভাষা হিসেবে তালিকাবদ্ধ করেছিল। (Ibrahim, 2016)

যেভাবে ধর্ম পরিচয়ের ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান মিলে পাকিস্তান রাষ্ট্রটি তৈরি হয়েছিল, সেভাবেই ধর্ম পরিচয়ের ভিত্তিতেই ব্রিটিশরা তাদের নীতি নির্ধারণের সুবিধার্থে এই ধর্মীয় বিভাজনকেই প্রাধান্য দিত, যদিও ধর্মীয় পরিচয়ের বাইরেও তাদের সংস্কৃতি, ভাষা ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য দিয়ে তাদের জাতিগত পরিচয় নির্ধারণ করা যেত। পরবর্তীতে ১৯৪৮ সালে বার্মা স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভাবের পরও ১৯৭৪ সালে নে উইনের শাসনের সময় আমরা দেখি বার্মা আরো ১৩৫টি গোষ্ঠীকে নৃগোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃতি দিলেও রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে আলাদাভাবে স্বীকৃতি দেয়নি। আরাকানে কামান, কামি, দাইংনেত, মায়াগি, মাইয়ো, থেট নামে অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী স্বীকৃতি পেলেও রোহিঙ্গারা অবৈধ অভিবাসী হিসেবে পরিচিতি পেয়েছিল। (Nemoto, 2013) এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৮২ সালে সংবিধানে রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্বকে অস্বীকার করা হয়েছে এবং সর্বশেষ রাখাইন কমিশন ও কফি আনান কমিশনের প্রদত্ত যৌথ রিপোর্টে আমরা দেখি মিয়ানমার সরকার কফি আনান কমিশনকে বিশেষ অনুরোধ করেছে রোহিঙ্গা শব্দটি ব্যবহার না করে রোহিঙ্গাদের আরাকানি মুসলিম হিসেবে সম্বোধন করতে। (Rakhine Commission Report, 2017)

২০১৪ সালে যে আদমশুমারি করা হয় সেখানেও রোহিঙ্গা হিসেবে পরিচয় দেয়ার কোনো সুযোগ রাখা হয়নি। তবে এর পরিবর্তে রোহিঙ্গাদের বাঙালি হিসেবে পরিচয় প্রদানের সুযোগ দেয়া হয়। এবং জানানো হয় যে যারা বাঙালি হিসেবে পরিচয় দেবে না এবং রোহিঙ্গা হিসেবে পরিচয় দেবে তাদেরকে আদমশুমারিতে গণনায় ধরা তো হবেই না, বরং তাদের রেজিস্ট্রেশনও বাতিল ঘোষণা করা হবে। ২০১৪-র আদমশুমারিতে দেখা যায় মিয়ানমারের জনসংখ্যা ৫১.৪ মিলিয়ন, যা পূর্ববর্তী সরকারের সময় ৬০ মিলিয়ন ধরা হয়েছিল। ধারণা করা হয়, রাখাইনের আরো অনেক মানুষসহ ১.২ মিলিয়ন রোহিঙ্গাকে মিয়ানমারের নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়নি। (Melissa Crouch, 2016)

ব্রিটিশ শাসনামলে (১৮২৬-১৯৪৮) বনজঙ্গল পরিষ্কার করে আবাদযোগ্য করার জন্য এবং কৃষিকাজ করার জন্য ব্রিটিশরা উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষকে আরাকানে আসতে উদ্বুদ্ধ করে। তখন চট্টগ্রাম থেকে অনেকেই আরাকানে এসে বসবাস শুরু করে, যাদের অনেকেই ছিল মুসলিম। ব্রিটিশ শাসনামলে মোট তিনটি অ্যাংলো-বার্মিজ যুদ্ধ হয়। প্রথমটি হয়েছিল ১৮২৪ সালে, দ্বিতীয়টি ১৮৫২ সালে এবং তৃতীয়টি ১৮৮৫ সালে। ব্রিটিশদের নীতিগতভাবে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের প্রাধান্য না দিয়ে অন্যান্য ধর্মাবলম্বী, যেমন–ভারতীয় মুসলিম ও হিন্দু, মুসলিম রোহিঙ্গা ও খ্রিস্টান কাচিনদের গুরুত্ব দেয়াটা বর্মীরা ভালো চোখে দেখত না। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বর্মীদের ক্ষোভ এই কারণে দিনে দিনে আরও বাড়তে থাকে যখন গুরুত্বপূর্ণ পদে বর্মী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের না দিয়ে ভারতীয়দের নিয়োগ দেয়া হয়। ১৯৪২ সালে যখন জাপানিরা ব্রিটিশদের বিতাড়ন করার উদ্দেশ্য দেখিয়ে বার্মা আক্রমণ করে তখন জাতীয়তাবাদী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা জাপানিদের পক্ষে ছিল। আর এদিকে রোহিঙ্গারা, যারা তখনো বার্মিজদের আক্রোশের শিকার, তারা নিজেদের টিকে থাকার কৌশল হিসেবে ব্রিটিশদের পক্ষ নেয়। সেই সময় থেকে জাতীয়তাবাদী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বর্মীরা রোহিঙ্গাদের প্রতি আরো ভয়াবহরূপে বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করতে থাকে। আজিম ইব্রাহীমের বইয়ের উল্লিখিত একটি সূত্র ধরে ১৯৪২-এর দাঙ্গার একটি চিত্র পাওয়া যায়। অনুমান করা হয়, ৩০৭টি গ্রাম ধ্বংস করে ফেলা হয়, এক লাখ রোহিঙ্গা জীবন হারায় এবং আরো ৮০ হাজার পালিয়ে যায়। রোহিঙ্গাদের ইতিহাস ঘাঁটতে গিয়ে অনেক বইয়েই আমি এই পরিসংখ্যানটি দেখিনি। তাই এ পরিসংখ্যানটির সত্যতা সম্পর্কেও কোনো মন্তব্য করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে কক্সবাজারে বসবাসরত রোহিঙ্গারা, যারা ১৯৪২ সালের পূর্বে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছেন, তাদের অনেকেই পূর্বপুরুষদের মুখ থেকে এই দাঙ্গার ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করেছেন বলে জানা যায়।

১৯৪২ সালে যখন জাপানিরা ব্রিটিশদের বিতাড়ন করার উদ্দেশ্য দেখিয়ে বার্মা আক্রমণ করে তখন জাতীয়তাবাদী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা জাপানিদের পক্ষে ছিল। আর এদিকে রোহিঙ্গারা, যারা তখনো বার্মিজদের আক্রোশের শিকার, তারা নিজেদের টিকে থাকার কৌশল হিসেবে ব্রিটিশদের পক্ষ নেয়। সেই সময় থেকে জাতীয়তাবাদী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বর্মীরা রোহিঙ্গাদের প্রতি আরো ভয়াবহরূপে বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করতে থাকে।

এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ না করলে উপরোল্লিখিত রোহিঙ্গা বিদ্বেষ সম্পর্কে ধারণাকে সরলীকরণ করা হবে। মিয়ানমারের বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদী আধিপত্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রীয় রাজনীতির সাথে সীমান্তে বসবাসরত সংখ্যালঘুদের অবিশ্বাসের দৃষ্টান্ত শুধু রোহিঙ্গাদের দিয়ে দেখলেই হবে না। পূর্বের তৈরি হওয়া পারস্পরিক অবিশ্বাসের রেষ ধরেই ১৯৪৯ সাল থেকে বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী সশস্ত্র আন্দোলন শুরু করে। এর মধ্যে কায়িন, কাচিনদের কথা উল্লেখ না করলেই নয়। কায়িনদেরও ব্রিটিশ সরকার নিজেদের ঔপনিবেশিক ক্ষমতা রক্ষায় সৈন্য হিসেবে ব্যবহার করেছিল এবং যখন তারা উপলব্ধি করেছিল ব্রিটিশরা তাদের স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার পূরণ করেনি, তখন ১৯৪৮ সালের পর থেকেই তারা সশস্ত্র আন্দোলন করে মিয়ানমারের কেন্দ্রীয় অংশের ও বদ্বীপ অংশের কিছু শহর নিজেদের দখলে নিয়ে এসেছিল। আর এর ফলে মিয়ানমার সরকার সামরিক বাহিনী থেকে কায়িনদের বের করে দেয় এবং কায়িনরা মিয়ানমারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। মিয়ানমার সরকার তাদের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নেয়। এবং পরবর্তীতে আমরা দেখি নে উইন সরকার শুধু রোহিঙ্গা নয়, ভিন্ন নৃগোষ্ঠীর এই উপস্থিতিকে জাতি গঠনে ঐক্য অর্জনের বাধা হিসেবে দেখত এবং এই ধারণার পক্ষে জনমত গঠন করতে সক্রিয় ছিল। (Wade, 2017)

১৯৪২ সালের দাঙ্গার পর মুসলিম ও বৌদ্ধদের মধ্যে বিভাজন আরো বাড়তে থাকে। ব্রিটিশরা অবস্থানচ্যুত আরাকানের রোহিঙ্গাদের সৈন্য হিসেবে নিয়োগ দিতে থাকে। নিয়োগের সময় ব্রিটিশরা অঙ্গীকার করে যে ব্রিটিশদের পক্ষে যুদ্ধ করার বিনিময়ে রোহিঙ্গারা আরাকানে একটি মুসলিম রাষ্ট্র গঠন করতে পারবে। ব্রিটিশরা জাপানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জিতে যাবার পর তারা নিজেদের অঙ্গীকার রক্ষার কোনো চেষ্টা করেনি। এদিকে ১৯৪৭ সালে কিছু রোহিঙ্গা মিলে নিজেদের ফৌজ গঠন করে এবং বুথিডং ও মংডুকে পূর্ব পাকিস্তানের অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে। কিন্তু রাজনৈতিকভাবে যথেষ্ট সংগঠিত

না হওয়ায় শুধু আকাঙ্ক্ষা দিয়ে সেই উদ্দেশ্য হাসিলে তারা ব্যর্থ হয়। অন্যদিকে ১৯৪৮ সালে বার্মা ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করে। তখন বার্মার সীমানার ভেতরে পড়ে যায় রোহিঙ্গাদের বাসস্থান মংডু, বুথিডং ও রুথিডং জেলা। কিছু মুসলিম তখন রেঙ্গুনে নবগঠিত সংবিধান সভায় মংডু ও বুথিডংকে পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পিটিশন জমা দেয়। এই পিটিশনের কারণ দেখিয়ে বার্মা রোহিঙ্গাদের স্বাধীন বার্মার শত্রু হিসেবে গণ্য করতে শুরু করে। (Ibrahim, 2016) অন্য একটি সূত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হয়ে কিছু রোহিঙ্গা প্রেসিডেন্ট জিন্নাহর কাছে উত্তর আরাকানকে (মংডু, বুথিডং ও রুথিডং জেলা) পূর্ব পাকিস্তানের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার প্রস্তাবও উত্থাপন করে। (Courson-Neff, 2000)

এমনিতেই জাতীয়তাবাদী রোহিঙ্গারা ১৯৪৮-এর আগে রোহিঙ্গাদের প্রতি জাতিবিদ্বেষ প্রদর্শন করে আসছিল। গুটিকয়েক রোহিঙ্গার বার্মা থেকে আলাদা হবার রাজনৈতিক ইচ্ছা প্রকাশকে কেন্দ্র করে বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদী বার্মিজরা রোহিঙ্গাদের স্বাধীন বার্মার শত্রু ভাবতে থাকে। সামষ্টিকভাবে বহন করা এই স্মৃতি নানা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে। এর ফলে ১৯৮২-র সংবিধানে ১৮২৪ সালের পূর্বে বসবাসরত মুসলিমদের প্রমাণসহ নাগরিক অধিকারের স্বীকৃতি দিলেও ১৮২৪ সালের পর আগতদের বহিরাগত হিসেবেই দেখতে চেয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। ১৯৮২-র সংবিধানের যথার্থতা প্রতিষ্ঠা করতে অনেকেই সুচিন্তিতভাবে এই অবস্থানের পেছনে যুক্তি হাজির করলেও এই পুরো প্রক্রিয়া ১৮২৪ সালের আগে বসবাসরত রোহিঙ্গাদেরও পূর্ণ নাগরিকত্ব লাভ থেকে বঞ্চিত করেছে, কারণ ১৬০ বছর আগের দলিলসহ প্রমাণ অনেকের কাছেই ছিল না। রোহিঙ্গারা আদি বাসিন্দা ছিল কি ছিল না, বা তারা জন্মসূত্রে নাগরিক হিসেবে গণ্য হবে কি হবে না সেই প্রশ্নগুলো এড়িয়ে গিয়ে যেহেতু ১৮২৪ সাল (ব্রিটিশদের আরাকান দখলের সময়) নাগরিকত্বের বিধান প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, তাই বলতেই হয়, রোহিঙ্গাদের প্রতি কাঠামোগত বৈষম্যের ও জাতিগত নিধনের কারণ মূলত জনমনে দীর্ঘদিন ধরে জাতিগত বিদ্বেষ বাড়তে দেয়া এবং এর বিপক্ষে জনমত তৈরিকে শক্তহাতে দমন করা। বর্মী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের এই বিদ্বেষ ব্রিটিশ শাসনামলে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মাবলম্বী ভারতীয়, পাকিস্তানি, নেপালি, বাঙালি–সব জাতিগোষ্ঠীর মানুষের প্রতি আগে থেকেই ছিল। দেশভাগের পর এই বিদ্বেষ ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত থাকলেও রোহিঙ্গাদের ব্যাপারে এই বিদ্বেষের মাত্রা আরো বৃদ্ধি হওয়ার কারণ ছিল রোহিঙ্গাদের নিজেদের পরিচয় পূর্ব পাকিস্তান নামক মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে জড়িয়ে ফেলা।

এমনিতেই জাতীয়তাবাদী রোহিঙ্গারা ১৯৪৮-এর আগে রোহিঙ্গাদের প্রতি জাতিবিদ্বেষ প্রদর্শন করে আসছিল। গুটিকয়েক রোহিঙ্গার বার্মা থেকে আলাদা হবার রাজনৈতিক ইচ্ছা প্রকাশকে কেন্দ্র করে বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদী বার্মিজরা রোহিঙ্গাদের স্বাধীন বার্মার শত্রু ভাবতে থাকে। সামষ্টিকভাবে বহন করা এই স্মৃতি নানা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে।

৪.

এখন প্রশ্ন আসতে পারে, জাতিগত বিদ্বেষ কি অর্থনৈতিক লাভ-ক্ষতির সাথে একেবারেই সম্পৃক্ত নয়? অবশ্যই সম্পৃক্ত, কারণ জাতিগত বিদ্বেষ অনেক কিছুর সমষ্টি, যার একটি উপাদান অর্থনৈতিক লাভ- ক্ষতি। বার্মার ইতিহাস ঘাঁটতে গিয়ে আমরা দেখেছি, পুরো দক্ষিণ এশিয়ায় বার্মা সবচেয়ে সম্পদশালী দেশ ছিল। আবহাওয়া, নদনদী, মাটির উর্বরতা, বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদের লভ্যতার বিবেচনায় পুরো ভারতবর্ষ থেকেই এখানে মানুষের আগমন ঘটেছে জীবিকার সন্ধানে। বৌদ্ধ ধর্মগরিষ্ঠ অঞ্চল হিসেবে যেই ধর্ম বা জাতির মানুষ এসেছে এদেশে, তাদের সকলেই ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে অনেক বার্মিজের মধ্যে বিদেশিদের প্রতি ভীতিজনিত বৈরিতা (xenophobia) প্রত্যক্ষ করেছে। সেই হিসাবে বলা যায়, ব্রিটিশরা যেমন ঔপনিবেশিক আধিপত্য কায়েমের কারণে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী অনেক বার্মিজের কাছে অপ্রিয় ছিল, তেমন প্রতিবেশী অঞ্চল থেকে আগত ভিন্ন ধর্মাবলম্বী, যেমন–হিন্দু ও মুসলিমদেরকে তারা দেখত অর্থনৈতিক সুযোগ কেড়ে নেয়ার মতো প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে। সেদিক থেকে চিন্তা করলে রোহিঙ্গাদের ব্যাপারে জাতিগত বিদ্বেষের মধ্যে অর্থনৈতিক লাভ-ক্ষতি অবশ্যই বিদ্বেষের একটা উপাদান হিসেবে দেশভাগের আগে থেকেই অন্তর্নিহিত ছিল। তবে ব্রিটিশ শাসনামলে এই বিদ্বেষ যেভাবে কাজ করত, ১৯৪৮-এর পর স্বাধীন বার্মায় এই বিদ্বেষ নতুন ডালপালা ধরে বিস্তৃত হতে থাকে।

দেশভাগের পর থেকে রোহিঙ্গাদের শুধু অর্থনৈতিক সুযোগ লাভে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখা হতো না, বরং রোহিঙ্গাদের ধরে নেয়া হতো একটি স্থায়ী সম্ভাব্য শত্রু, যারা অর্থনৈতিক সুবিধা আদায়ের মধ্যে সীমিত না থেকে বংশবিস্তার ও ধর্মবিস্তারের মধ্য দিয়ে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের টিকে থাকার পথে একটি হুমকি হিসেবে আবির্ভূত হবে একদিন। আর এই প্রোপাগান্ডার পেছনের অভিসন্ধি প্রকাশ পায় ১৯৬২ সালে নে উইনের ক্যুর মাধ্যমে বার্মায় সামরিক শাসন (১৯৬২-৮৮) কায়েম হওয়ায় এবং নে উইনের বহুল প্রচলিত 'বার্মিজ ওয়ে অব সোশ্যালিজম' প্রতিষ্ঠার প্রতি অনুরাগ লক্ষ করে। বার্মিজ ওয়ে অব সোশ্যালিজম আসলে ছিল সোশ্যালিজম কায়েমের নাম করে বিভিন্ন শিল্পকারখানাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা, সামরিক আধিপত্য বিস্তার করা এবং কিছু এলিট শ্রেণীর হাতে পুঁজির একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ অর্পণ করা। ১৯৬২ সালের মিলিটারি ক্যুর পর থেকে ১৫ হাজার ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়। নে উইনের শাসনামলে ১ লাখ ২৫ হাজার থেকে তিন লাখ ভারতীয় মিয়ানমার ছেড়ে ভারতে ফিরে যায়। (Jones, 2017) ভারতীয়রা ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রসার ঘটিয়েছিল, পুঁজির মালিকানার নিয়ন্ত্রণে দিন দিন শক্তিশালী হয়ে উঠছিল, অনেক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ভারতীয়দের কাছ থেকে ঋণ নিত। এইসব নিয়ন্ত্রণ খর্ব করতে এবং নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজন ছিল সামরিক সরকার। বার্মাকে যতই বহিরাগত ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের শক্তির সামনে অসহায় ও অরক্ষিত হিসেবে উপস্থাপন করা যায় ততই জাতীয় নিরাপত্তার রক্ষক হিসেবে সামরিক শাসনকে গণতন্ত্রের তুলনায় জনগণের সামনে অধিক বাঞ্ছনীয় হিসেবে উপস্থাপন করা যায়। সম্ভাব্য বিপজ্জনক বহিঃশক্তি হিসেবে সামরিক সরকার বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদকে শুধু বিদেশি শক্তির বিরুদ্ধেই নয়, বরং দেশের ভেতরের রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধেও উস্কে দিয়েছিল। উ নু সরকার মুসলিমদের সমর্থন লাভের জন্য মুসলিমদের সংখ্যা বেশি এমন সব অঞ্চলে, যেমন– বুথিডং, মংডু ও পশ্চিম রথিডংকে আরাকান থেকে আলাদা করে মায়ু ফ্রন্টিয়ার নামে একটা আলাদা প্রশাসনিক বিভাগ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। মুসলিম (রোহিঙ্গা) সংসদ সদস্যদের সমর্থন নিয়ে ফ্রন্টিয়ার প্রশাসনকে

কেন্দ্রীয় সরকারের সরাসরি নিয়ন্ত্রণের অধীনে আনতে চেয়েছিলেন। (Nemoto, 2013) এতে রোহিঙ্গারা আলাদাভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে থেকে সুযোগ-সুবিধা অর্জনে রাজনৈতিকভাবে চেষ্টা করতে পারত। কিন্তু ১৯৬১ সালের ২১ মে মায়ু ফ্রন্টিয়ার হিসেবে স্বীকৃতি পেলেও পরবর্তীতে নে উইন সরকার এসে ১৯৬৪ সালে সবকিছু ঢেলে সাজায়। এবং তখন মায়ু ফ্রন্টিয়ার হিসেবে আলাদা প্রশাসনিক কাঠামো বিলুপ্ত হয়। ১৯৭৮ সালে রোহিঙ্গাদের ওপর অপারেশন কিং ড্রাগন (অপারেশন নাগা মিন) পরিচালনা করা হয়। এই সহিংস আক্রমণের আগে থেকেই ১৯৭৭ সালে রাখাইনে পরিচয়পত্র হালনাগাদ করা এবং নতুন পরিচয়পত্র প্রদান করা নিয়ে একটি অভিযান হয়। উলেখ্য, এই পরিচয়পত্রের রঙের আবার বিশেষ কোড ছিল। যেমন–গোলাপি : পূর্ণ নাগরিকত্ব, নীল : অ্যাসোসিয়েটেড নাগরিক, সবুজ : ন্যাচারালাইজড নাগরিক, সাদা : বিদেশি। তখন রোহিঙ্গাদের কাছ থেকে তাদের পরিচয়পত্রগুলো নিয়ে নেয়া হয় এই প্রতিশ্রুতিতে যে তাদেরকে নতুন পরিচয়পত্র দেয়া হবে। কিন্তু পরে সেই পরিচয়পত্র আর ফেরত দেয়া হয়নি। ১৯৭৮ সালে তিন মাস ধরে সহিংস আক্রমণের শিকার হয়ে প্রায় ২ লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশ সীমান্ত অতিক্রম করে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নেয়। সেই সময় অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কো-অপারেশন (ওআইসি) বার্মার ওপর চাপ প্রয়োগ করতে থাকে আর তখন বার্মা পুনরায় রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয়। (Ibrahim, 2016) সেই সময় মিয়ানমার ওআইসির চাপের কারণেই রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয়, নাকি এর সাথে বার্মার সামরিক শাসকদের কোণঠাসা অবস্থা ও বৈশ্বিক কৌশলগত মিত্রশক্তির অভাব ইত্যাদিও জড়িত ছিল তা খতিয়ে না দেখেই অনেকের মধ্যে বদ্ধমূল ধারণা হয় যে বিদেশে রোহিঙ্গাদের ইসলামিক লবি এত শক্তিশালী যে মুসলিম রোহিঙ্গাদের টিকিয়ে রাখলে বহিঃশক্তির কাছে বার্মাকে নতজানু হতে হবে একদিন। আর তাই বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে রোহিঙ্গাদের প্রতি বিরূপ মনোভাবের অঙ্কুরকে সামরিক শাসনাধীন বার্মায় উদ্দেশ্যমূলকভাবে বেড়ে উঠতে দেয়া হয়।

রোহিঙ্গাদের প্রতি জাতিগত বিদ্বেষের চিত্রটি আবার ভিন্ন আঙ্গিকে ধরা দেয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় আসার পর। উলেখ্য, ইউনিয়ন সলিডারিটি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি (ইউএসডিপি) সরাসরি সামরিক মদদপুষ্ট একটি রাজনৈতিক দল, যা ২০১০-এ অং সান সু চির নেতৃত্বাধীন দল ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসির (এনএলডি) সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচনে বিজয়ী হয়। ২০১০-এর নির্বাচনের আগে ইউএসডিপি রোহিঙ্গাদের যাদের সাদা রেজিস্ট্রেশন কার্ড আছে তাদেরকে ভোট দিতে উদ্বুদ্ধ করতে রাখাইনে সরাসরি প্রচারণা চালায়। সে সময় রোহিঙ্গা এমপিও নির্বাচিত হয়। কিন্তু ২০১৫-র নির্বাচনে ইউএসডিপি বা এনএলডি কোনো দলই আর রোহিঙ্গাদের সম্ভাব্য ভোটার হিসেবে গণ্য করেনি, এর কারণ কট্টরপন্থী বর্মী/বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদীরা তখন জোর প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছিল যে এনএলডি একটি প্রো-মুসলিম পার্টি। অং সান সু চিকে হিজাব পরিয়ে এই ধরনের প্রোপাগান্ডা চালানো হয়। (Wade, 2017) এর কারণ ছিল এনএলডি আন্তর্ধর্মীয় বিয়ে (মুসলিম পুরুষ ও বৌদ্ধ নারী) নিষিদ্ধ করার বিলের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। যদিও এনএলডি মূলত নারী অধিকার কর্মীদের চাপে আন্তর্ধর্মীয় বিয়ে নিষিদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু পরে ক্ষমতায় এসে এনএলডি এই আইন বাতিল করেনি। তাছাড়া রোহিঙ্গাদের ভোট দেয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য নাইন-সিক্স-নাইন (৯৬৯) আন্দোলনের সাথে যুক্ত কট্টরপন্থী বর্মী/বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদীরা রোহিঙ্গাদের ভোট দেয়ার অধিকার খর্ব করার জোর দাবি তোলে। সব মিলে ২০১০ সালেও যে সামরিক মদদপুষ্ট ইউএসডিপি রোহিঙ্গাদের ভোট গ্রহণ করেছিল, ৫ বছরের ব্যবধানে শুধু ইউএসডিপিই নয়, এনএলডি ও কট্টরপন্থী বর্মী/বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ জনগণের মতের পক্ষে অবস্থান নিয়ে রোহিঙ্গাদের ভোটাধিকার দেয়া থেকে দূরে থাকে।

পরিচয়ের রাজনীতির এই ধারাবাহিকতা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, কট্টরপন্থী বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদী চেতনা আসলে রোহিঙ্গাদের অধিকার খর্ব করতে কোনো যুক্তি মানেনি। ১৯৯০ ও ২০১০-এর নির্বাচনে রোহিঙ্গাদের ভোটার হিসেবে ব্যবহার করে নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করলেও পরে সামরিক-বেসামরিক বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভোটের হিসাব-নিকাশ/নির্বাচনী রাজনীতি এবং জাতিগত ও ধর্মীয় বিদ্বেষ দ্বারা পরিচালিত হয়েই তারা প্রয়োজনমতো ২০১৫-র নির্বাচনে তাদের ভোট দেয়ার অধিকার হরণ করেছে।

৫.

শুধু কি সমাজে বিদ্যমান জাতিবিদ্বেষ বা ধর্মীয় বিদ্বেষ এমন একটি গণহত্যা সংঘটনের নেপথ্যে মূল ভূমিকা পালন করতে পারে? ১২ লাখ (১.২ মিলিয়ন) নিপীড়িত ও নাগরিক সুবিধা বঞ্চিত রোহিঙ্গারা আরাকানের মতো পশ্চাৎপদ অঞ্চলের বাসিন্দা হয়ে কী এমন হুমকি হয়ে উঠেছিল যে তাদের হত্যা করে, বাড়িঘর পুড়িয়ে, অমানবিক নির্যাতন করে তাড়িয়ে দিল এবং দেশের সচেতন জনগণ এই ভয়াবহ অমানবিকতা দেখেও প্রতিবাদ করল না? এটি অস্বীকার করার কিছু নেই যে রোহিঙ্গারা এমনিতেই সব সময় শুধু নাগরিক সুবিধা বঞ্চিতই ছিল না, এই জনগোষ্ঠীকে নজরদারিতে রাখার জন্য সৃষ্ট নাসাকা বাহিনী বিভিন্নভাবে তাদের ওপর জোরজুলুম চালিয়েছে। বহু বছর ধরেই রোহিঙ্গারা ধীরে ধীরে নিজ ভূমি ছেড়ে বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়াসহ আরো অনেক দেশে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। অর্থাৎ ১৯৭৮, ১৯৯১, ২০১২ এবং ২০১৬, ২০১৭-তে যে বড় ধরনের সহিংসতার রূপ আমরা দেখেছি, তার বাইরেও নানা ধরনের সহিংসতার যেমন–অর্থনৈতিক বঞ্চনার, সামাজিক বঞ্চনার শিকার হয়ে আসছিল রোহিঙ্গারা। জাতিবিদ্বেষ বা ধর্মীয় বিদ্বেষ এমন কোনো বিষয় না, যা হঠাৎ করে নিরীহ থেকে সহিংস হয়ে উঠতে পারে যে কোনো ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে। এই জিইয়ে রাখা ও সময়মতো উস্কে দেয়ার পেছনে অত্যন্ত জটিল ও বহুমাত্রিক সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ক্রিয়াশীল রয়েছে। এবং এই কারণগুলো একটি আরেকটির সাথে নির্ভরশীলতার সূত্র ধরেই ধীরে ধীরে এই অবশ্যম্ভাবী পরিণতির দিকে ধাবিত হয়েছে। আর এর উৎস অনুসন্ধান করতে গেলে তাই এই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়গুলোকে আলাদা করে দেখা যাবে না।

> এখন প্রশ্ন আসতে পারে, জাতিগত বিদ্বেষ কি অর্থনৈতিক লাভ-ক্ষতির সাথে একেবারেই সম্পৃক্ত নয়? অবশ্যই সম্পৃক্ত, কারণ জাতিগত বিদ্বেষ অনেক কিছুর সমষ্টি, যার একটি উপাদান অর্থনৈতিক লাভ-ক্ষতি।

আগেই বলেছি যে, সামরিক শাসনামলে যখন জনগণের মধ্যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে দাঁড়াতে শুরু করে তখন নে উইন সামরিক শাসনকে জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য করার জন্য জাতীয়তাবাদী চেতনাকে ব্যবহার করে কিছু কল্পিত গণশত্রুকে হাজির

করেছে আর তার মধ্যে মুসলিম রোহিঙ্গারা ছিল অন্যতম। সত্তরের দশকে নে উইনের বার্মিজ ওয়ে অব সোশ্যালিজম যখন অর্থনৈতিক দুর্যোগের আকার ধারণ করে তখন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে নে উইন এমন একটি শিকার খুঁজছিল যার ওপর জাতীয় শত্রুর তকমা ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের নীতি আরোপ করলে জনগণের মধ্যে খুব একটা প্রতিক্রিয়া হবে না, বরং উল্টো অর্থনৈতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সামরিক সরকারের অঙ্গীকার রক্ষার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। আর তখন নে উইনের জন্য রোহিঙ্গাদের ওপর আক্রমণই সবচেয়ে সুবিধাজনক ছিল। এরই বহিঃপ্রকাশ ছিল ১৯৭৮-এ রোহিঙ্গাদের ওপর সহিংস আক্রমণ, যার পর প্রায় দুই লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে পালিয়ে আসে। পরবর্তীতে ১৯৯০ সালে আবার একটি সহিংস আক্রমণ হয়, যার পর প্রায় আড়াই লাখ রোহিঙ্গা দ্বিতীয় দফায় বাংলাদেশে আসে।

১৯৯০ সালে গণতন্ত্রের আইকন হিসেবে খ্যাত অং সান সু চি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে যে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন, সে কারণেই ১৯৯০-এর নির্বাচনে অং সান সু চি বিপুল ভোটে জয়ী হন। কিন্তু সামরিক বাহিনী নির্বাচনের ফলাফল অস্বীকার করে সামরিক শাসন পুনর্বহাল করে। সে সময় রোহিঙ্গারা আবার নতুন করে সহিংসতার শিকার হয়। এবারের আক্রমণের কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, ১৯৯০-এর নির্বাচনে রোহিঙ্গারা ভোট দিয়েছিল এবং তাদের কিছু প্রতিনিধি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করেছিল। এরপর যেসব রোহিঙ্গা বাংলাদেশ থেকে রাখাইনে ফিরে যায় তাদের অনেকেই তাদের ফেলে আসা বাড়িঘর ফেরত পায়নি। একটি পুরো গোষ্ঠীকে একেকটি জায়গা থেকে অবস্থানচ্যুত করার কারণে ফিরে এসে তারা আর সেই ধ্বংস হওয়া সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা নিজ স্থানটি পুনরুদ্ধার করতে পারেনি। অনেক ঘরবাড়ি, বাসস্থান অন্যদের দখলে চলে গেছে, কিছু কিছু গ্রামে রাখাইনদের জন্য নতুন বাড়িঘর নির্মাণ করে রাখাইন গ্রামে পরিণত করা হয়েছে। এবং নির্মাণকাজে রোহিঙ্গাদের জোরপূর্বক শ্রমিক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। (Ibrahim, 2016)

তাছাড়া ১৯৯২ সালে মিলিটারি জান্তা নাসাকা নামে একটি সীমান্তরক্ষী বাহিনী তৈরি করে। এই বাহিনী তৈরি হয় মূলত পুলিশ, আর্মি, কাস্টমস, ইমিগ্রেশন অফিসের সমন্বয়ে। নাসাকা বাহিনীর উদ্দেশ্য ছিল সীমান্তে মানুষের আসা-যাওয়া নজরদারিতে রাখা এবং উত্তর রাখাইনে জনসংখ্যা বৃদ্ধি যাতে নিয়ন্ত্রণে থাকে সেদিকে লক্ষ রাখা। এই নাসাকা বাহিনী পরে জঘন্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের কাজে জড়িয়ে পড়ে। বিয়ে করতে চাইলে রোহিঙ্গারা বিয়ে করতে পারত না, নাসাকা বাহিনীকে ঘুষ দিতে হতো অনুমতি নিতে হলে। তারা ধর্ষণ, শারীরিক নির্যাতন, জোরপূর্বক শ্রম দিতে বাধ্য করাসহ আরো নানা অপকর্মের সাথে যুক্ত ছিল। কোনো যুগল বিয়ে করতে চাইলে টাকার অভাবে নাসাকাকে ঘুষ দিতে ব্যর্থ হলে লুকিয়ে বিয়ে করত এবং মেয়েরা গর্ভধারণ করলে তাদের লুকিয়ে রাখত। নাসাকা বাহিনী এ রকম পরিস্থিতিতে হাত দিয়ে মেয়েদের পেট ধরে পর্যবেক্ষণ করত তারা গর্ভবতী কি না। এভাবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা ছাড়াও অর্থনৈতিকভাবে নানা রকম শোষণ করত। রোহিঙ্গাদের ব্যবসা-বাণিজ্য করতে হলে নাসাকাকে চাঁদা দেয়া, ঘুষ দিয়ে অনুমতি আদায় করা ছিল নিত্যনৈমিত্তিক বাস্তবতা। ২০০৫ সালের পর থেকে নাসাকা মিয়ানমারের ভূমি নীতি বাস্তবায়নের অজুহাতে কৃষিজমি ও চাষের জমি রক্ষা করার নামে রোহিঙ্গাদের বহু ঘরবাড়ি ধ্বংস করে দিয়েছে, তাদের অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য করেছে।

১৯৭৮ ও ১৯৯০-এর সহিংস আক্রমণ এবং সর্বোপরি রোহিঙ্গাদের ওপর সার্বক্ষণিক নিপীড়নমূলক পদক্ষেপের পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, জনগণের কাছে সামরিক শক্তি প্রদর্শন ও সামরিক শাসনের যৌক্তিকতা তুলে ধরতে বারবার রোহিঙ্গারা ব্যবহৃত হয়েছে। এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত করার দৃষ্টান্ত দেখা গেছে। অর্থাৎ শুধু জাতিগত বিদ্বেষ থাকাটাই যথেষ্ট ছিল না, একে ব্যবহার করে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বঞ্চনার শিকার বানাতে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ সব সময়ই দরকার ছিল।

৬.

পরবর্তী প্রশ্ন উঠতে পারে ২০১০ সালের পর গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় এলে কি এই প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবার কথা? এর উত্তর খুঁজতে হলে গণতান্ত্রিক সরকার আদৌ কতটুকু গণতান্ত্রিক, সে প্রশ্নই মুখ্য হয়ে ওঠে। আর তাই উত্তরটি 'না'। অর্থাৎ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার পেছনে কলকাঠি ঘোরানোয় নিয়োজিত সামরিক শক্তি বরং এখন গণতন্ত্রকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে পেছন থেকে এই কাজটি আরো নির্বিঘ্নে করার পথ তৈরি করে নিয়েছে। লক্ষণীয় ২০১২ সালের সহিংসতার পর নাসাকা বাহিনীকে সরিয়ে ফেলা হয়, কিন্তু তাতে সামরিক নিপীড়ন কমেনি, বরং অন্য চেহারা ধারণ করেছে। এখন রোহিঙ্গা নিধনের বৈধতা প্রতিষ্ঠার জন্য তারা জাতিবিদ্বেষের পাশাপাশি বহুল ব্যবহৃত কিছু পন্থা ব্যবহার করছে। জনগণের মধ্যে সন্ত্রাস সম্পর্কে ভীতি সঞ্চার করে, আন্তর্জাতিক ইসলামি জঙ্গি সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ততা নিয়ে প্রচারণা চালিয়ে এবং জাতীয় নিরাপত্তার হুমকি হিসেবে রোহিঙ্গাদের গণশত্রু হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে এই রোহিঙ্গা নিধনকে আরো সহজেই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী জাতীয়তাবাদী জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার নজির তৈরি করেছে।

এর মধ্যে দুটি কট্টরপন্থী আন্দোলনের উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। তার মধ্যে একটি হলো নাইন-সিক্স-নাইন[২] আন্দোলন, যার ভিত শুরু হয়েছিল নব্বইয়ের দশকের শেষ দিকে, কিন্তু যাকে ২০১২ সাল থেকে ব্যবহার করা হয়েছিল জাতিবিদ্বেষ উস্কে দিতে এবং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের আলাদাভাবে দৃশ্যমান করে তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করতে। নাইন-সিক্স-নাইন আন্দোলনের ক্ষেত্রে দেখেছি বৌদ্ধদের মালিকানাভুক্ত দোকান বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সাইনবোর্ডে

২. ১৯৯০-এর শেষের দিকে নাইন-সিক্স-নাইন চিহ্নটি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা নিজেদের অস্তিত্ব জানান দিতে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে এলেও নাইন-সিক্স-নাইন মুভমেন্ট আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হয় ২০১২ সালের অক্টোবর মাসে। পাঁচজন তরুণ বৌদ্ধ ভিক্ষু এই আন্দোলনের প্রথমে নেতৃত্ব দেন। এর কোনো স্পষ্ট সাংগঠনিক কাঠামো ছিল না। আশিন উইরাথু ছাড়া এই আন্দোলনের কোনো ব্যক্তি প্রকাশ্যে গণমাধ্যমে উপস্থিত হয়নি কখনো। তবে তারা ফেসবুক ও অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। ইসলামবিরোধী প্রোপাগান্ডা ব্যবহার করে জাতিবিদ্বেষের বীজ বপন করা তাদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। মুসলিমদের হাত থেকে বাঁচার তাগিদ থেকে যে তারা বৌদ্ধদের ঐক্যবদ্ধ হবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রচারণা ও সচেতনতার প্রয়োজন আছে তা প্রচার করে যেত। মুসলিমরা অনেক আগে থেকেই ৭৮৬ নম্বরটি ব্যবহার করত হালাল খাবারের দোকানে চিহ্ন হিসেবে। নাইন-সিক্স-নাইনের সমর্থকরা প্রচারণা চালায় যে (৭+৮+৬=২১) নম্বরটির অর্থ হচ্ছে একুশ শতাব্দীর মধ্যে মুসলিমরা মিয়ানমারকে একটি মুসলিম দেশে পরিণত করবে। এবং এই উদ্যোগ যাতে সফল না হয় সেজন্য ৯৬৯ নম্বরটা ব্যবহার অরে সর্বস্তরে তারা প্রচারণা শুরু করে। এই ৯৬৯ স্টিকার এত জনপ্রিয় হয়ে ওঠার পেছনে কারণ ছিল ৯৬৯ চিহ্নটি শুধু বৌদ্ধ ধর্মীয় একটি চিহ্ন হিসেবেই প্রতিষ্ঠা করেছিল তারা তা নয়, এই চিহ্নটি গুণাগুণে সমৃদ্ধি আনে এমন একটি ধারণাও মানুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করতে তারা সক্ষম হয়েছিল। দেখা গেছে, এমন সব মানুষও এই চিহ্নটি ব্যবহার করা শুরু করে, যারা সত্যিকার অর্থে কট্টরপন্থী মনোভাব বা নাইন-সিক্স-নাইনের মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিল না। এই আন্দোলন প্রোপাগান্ডা এবং ঘৃণা ছড়ানোর জন্য আন্তর্জাতিকভাবে অনেক নিন্দিত হবার পর ধীরে ধীরে এই আন্দোলন কিছুটা হলেও স্তিমিত হয়ে আসে বলা যায়, এই কারণে যে তারা যে ভিডিও প্রচার করে ক্যাম্পেইন চালাত, সেগুলোর লিংক ওয়েবসাইট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে সরিয়ে নেয়া হয়।

নাইন-সিক্স-নাইন চিহ্ন ব্যবহার করে বৌদ্ধদের এইসব দোকানে কেনাকাটা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হতো। অন্যটি হলো মা-বা-থা[৩] আন্দোলন, যা শুরু হয়েছিল ২০১৩ সালে। মা-বা-থাই আন্তর্ধর্মীয় বিয়ে নিষিদ্ধ করার পক্ষে জনমত গঠন করে এবং কট্টরপন্থী বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদকে রাজনৈতিক স্বার্থে উস্কে দিতে প্রচারণা চালায়। কাজেই রোহিঙ্গা নিধনে জাতিবিদ্বেষ কাজ করেছে এটুকু লক্ষ করলেই যথেষ্ট নয়, বরং এই জাতিবিদ্বেষকে কাজে লাগিয়ে কারা এই রাজনীতি থেকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুফল ভোগ করছে তা-ও লক্ষ করতে হবে। এসব ক্ষেত্রে মা-বা-থা ও নাইন-সিক্স-নাইন আন্দোলনকে ব্যবহার করে জণগণের সমর্থন আদায় করার কৌশলটিকেও লক্ষ করতে হবে। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় এইসব ধর্মবিদ্বেষমূলক প্রচারণার মাধ্যমে জাতিবিদ্বেষকে জিইয়ে রাখা ও উস্কে দেয়ার কৌশল গ্রহণ এটাই স্পষ্ট করে যে সামরিক সরকারের সময় সৃষ্ট নাসাকা বাহিনীর প্রয়োজন হয় না, বরং প্রয়োজন হয় জনসমর্থনের।

পুরো মিয়ানমারে রোহিঙ্গাবিরোধী প্রচারণা চালানোর পাশাপাশি আরাকানে জাতিবিদ্বেষী প্রচারণায় স্থানীয় রাখাইনদেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। আরাকানে বৌদ্ধ রাখাইন ও মুসলিম রোহিঙ্গাদের মধ্যে জাতিগত বিদ্বেষ অনেক পুরনো হলেও জাতিগত দাঙ্গা ও রক্তপাত মূলত শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এবং ১৯৪২ সালে জাপানিদের আক্রমণের সময় তা ভয়াবহ আকার ধারণ করে। ব্রিটিশরা জাপানি আক্রমণের সময় তাদের সাথে যুদ্ধ করতে যে ভি-ফোর্স গঠন করে সেখানে অনেক আরাকানি মুসলিম নিয়োগ দেয়া হয়। ব্রিটিশরা সে সময় জমিদারি প্রথা প্রবর্তন করে এবং হাজার হাজার একর জমি বাঙালি মুসলিমদের দিয়ে দেয়। রাখাইন কৃষক যারা এর আগে বার্মা ছেড়ে চলে গিয়েছিল তারা ফিরে এসে তাদের জমির মালিকানা ফেরত পায়নি। (Chan, 2005) ব্রিটিশ শাসনমালে শুরু হওয়া দাঙ্গা ১৯৪৮ সালের পর আবার নতুন করে শুরু হয়। জিহাদের নামে মুসলিম মৌলভিদের নেতৃত্বে এই দাঙ্গা আরো চাঙ্গা হয়ে ওঠে। মোশে ইয়েগারের মতে, এই মুজাহিদীন বিদ্রোহের কারণ ছিল জাপানি আক্রমণের সময় যে মুসলিমরা পালিয়ে গিয়েছিল তারা ফিরে এসে আবার নিজেদের ভূমির মালিকানা দাবি করেছিল। অর্থাৎ রাখাইনদের সাথে রোহিঙ্গাদের জাতিগত দাঙ্গার ইতিহাস পুরনো হলেও স্বাধীন বার্মায় এই বিদ্বেষকে আরো উস্কে দেয়া হয় নির্বাচনে অংশগ্রহণকে কেন্দ্র করে।

যদিও ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসি (NLD) রাজনৈতিক অঙ্গনে সকল নৃগোষ্ঠীর অংশগ্রহণকে সমর্থন করে বলে দাবি করে, কিন্তু বাস্তবে দলটির ভিত্তিই তৈরি হয়েছে আসলে সংখ্যাগরিষ্ঠ বার্মিজদের দ্বারা। কারণ এনএলডি মুসলিম সদস্যদের দল থেকে বিতাড়ন করে দেয় এবং এর ফলে দলটির বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ওপর নির্ভরশীলতা বেড়ে যায়। ১৯৮৮ সাল থেকে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা দাবি করে, এনএলডি যেন মুসলিমবিরোধী হয়ে ওঠে। এ কারণে ১৯৮৮ সালের পর থেকে একক নৃগোষ্ঠী পরিচয়ভিত্তিক দল গড়ে ওঠে। আরাকানে বৌদ্ধ রাখাইনরা আরাকান লীগ ফর ডেমোক্রেসি (ALD) নামে তেমন একটি দল গঠন করে, যাদের উদ্দেশ্য ছিল রোহিঙ্গাদের রাজনৈতিকভাবে দুর্বল করা। রাখাইনদের এই দলটি চায়নি ১৯৯০-এর নির্বাচনে রোহিঙ্গারা ভোট দিক এবং যেসব রোহিঙ্গা জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিল তাদের নির্বাচনী জয়কেও তারা চ্যালেঞ্জ করে বসেছিল। পরবর্তীতে ২০১০ সালে আরাকান লীগ ফর ডেমোক্রেসি নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম রাখে রাখাইন ন্যাশনালিটিজ ডেভেলপমেন্ট পার্টি (RNDP)। নাম পরিবর্তন করলেও তাদের রোহিঙ্গাবিরোধী অবস্থানের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি, বরং ২০১২-১৩-তে যত জাতিগত সহিংসতা হয়েছে তার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে তারা বিশাল ভূমিকা রাখে। তারা রোহিঙ্গাদের বিতাড়িত করে স্থায়ীভাবে ইন্টারনাল রিফিউজি ক্যাম্পে বাস করতে বাধ্য করে। দলটি কট্টরপন্থী অন্যান্য বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদী দলের সাথেও তাদের একাত্মতা প্রকাশ করে এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে রোহিঙ্গা বিতাড়নে সক্রিয় থাকে। ২০১৫-এ রোহিঙ্গাদের ভোটাধিকার না দেয়ার পেছনে অনেক চক্রান্তকারী দলের সাথে মিলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কাজ করে।

এর পাশাপাশি রয়েছে আরাকানকে একটি অর্থনৈতিক অঞ্চল হিসেবে প্রতিষ্ঠার তাগিদ, সীমান্ত বাণিজ্য জোরদার করার প্রয়োজনীয়তা, সমুদ্রের বিপুল সম্পদ কাজে লাগানোর অপরিহার্যতা। এ প্রসঙ্গে সম্প্রতি ব্রিটেনের দুজন রাজনৈতিক অর্থনীতির গবেষক দুটি বিপরীতমুখী অবস্থান নিয়েছেন। এঁদের মধ্যে একজন সাসকিয়া সাসেন ২০১৭ সালে গার্ডিয়ানে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে রোহিঙ্গাদের ওপর নৃশংস আক্রমণের পেছনে ধর্মীয় বা জাতিগত বিদ্বেষের চেয়ে সামরিক-অর্থনৈতিক স্বার্থকে কারণ হিসেবে তুলে ধরেন। তিনি উলেখ করেন যে চীন রাখাইনে একটি বড় বন্দর ও শিল্প এলাকা নির্মাণের জন্য সম্প্রতি যে চুক্তি করেছে তা একটি বড় কারণ রোহিঙ্গা গ্রাম পুড়িয়ে দেবার পেছনে। তাছাড়া চীনের একটি ইনভেস্টমেন্ট গ্রুপ ৭.৩ বিলিয়ন ডলার খরচ করে কায়াকপ্যুতে (kyaukpyu) একটি গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ করবে, এবং তিন বিলিয়ন ডলার খরচ করে একটি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করবে। চীন এরই মধ্যে ২.৪৫ বিলিয়ন ডলার খরচ করে রাখাইন থেকে চীনের ইউনান প্রদেশ পর্যন্ত একটি পাইপলাইন নির্মাণের জন্য বিনিয়োগ করেছে। সাসেন আরো বলেন যে মিলিটারি ১৯৯০-এর দশক থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র কৃষকদের জোরপূর্বক ভূমি দখল চালিয়ে আসছে। ২০১২-র রোহিঙ্গা নিধনের সময় যে পরিমাণ জমি বৃহৎ প্রকল্পের জন্য অধিগ্রহণ করা হয় তা ২০১১ থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে প্রায় ১৭০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। সম্প্রতি রাখাইনের বাইরেও অন্যান্য অঞ্চলে মাইনিং, ড্যাম, টিম্বার খাতে ১৫ বিলিয়ন ডলার খরচ করেছে। (Sassen 2017) এইসব তথ্য উপস্থাপন করে সাসেন দাবি করেন, এই বিদেশি অর্থনৈতিক বিনিয়োগ এবং

> অনেকের মধ্যে বদ্ধমূল ধারণা হয় যে বিদেশে রোহিঙ্গাদের ইসলামিক লবি এত শক্তিশালী যে মুসলিম রোহিঙ্গাদের টিকিয়ে রাখলে বহিঃশক্তির কাছে বার্মাকে নতজানু হতে হবে একদিন। আর তাই বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে রোহিঙ্গাদের প্রতি বিরূপ মনোভাবের অঙ্কুরকে সামরিক শাসনাধীন বার্মায় উদ্দেশ্যমূলকভাবে বেড়ে উঠতে দেয়া হয়।

৩. এই আন্দোলনটি তৈরি হয় ২৭ জুন ২০১৩ সালের দিকে। মা-বা-থা একটি সংক্ষিপ্ত নাম, যার অর্থ হচ্ছে মিয়ানমারের দেশপ্রেমিক সংঘ বা Patriotic Association of Myanmar. নাইন-সিক্স-নাইন আন্দোলনে যারা যুক্ত ছিল তাদের অনেকেই পরে মা-বা-থা আন্দোলনে যুক্ত হয়। মা-বা-থা আন্দোলন পরবর্তীতে ৪টি আইন সংশোধনের পক্ষে জনমত গঠন করতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। তার মধ্যে একটি হলো আন্তর্ধর্মীয় বিবাহ, বিশেষ করে বৌদ্ধ ও মুসলিম বিবাহ বন্ধ করা, ধর্ম পরিবর্তন বন্ধ করা, বহুগামিতা প্রতিরোধ করা এবং জন্ম নিয়ন্ত্রণ আইনের মাধ্যমে মুসলিমদের বংশবিস্তার প্রতিরোধ করা। মা-বা-থা আন্দোলন পরবর্তীতে ২০১৫-এর নির্বাচনে ইউএসডিপির পক্ষে প্রচারণায় সহযোগী ভূমিকা পালন করে।

সামরিক-অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষাই এই বিপুল পরিমাণ রোহিঙ্গাকে তাদের বসবাসস্থল থেকে বিতাড়িত করার কারণ।

আরেকজন গবেষক লি জোনস সাসেনের উলিখিত চীনা বিনিয়োগের এলাকাগুলো মানচিত্রে দেখিয়ে উলেখ করেন যে এইসব প্রকল্প কোনোটিই মংডু, বুথিডং, ও রুথিডংয়ে যেসব এলাকায় রোহিঙ্গাদের গ্রাম পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে সেসব এলাকার ধারেকাছেও নয়। লি জোনস দেখান যে কায়াকপ্যু সংকটাপন্ন এলাকা থেকে ১২০ কিলোমিটার দূরে এবং সিতওয়ে ৪০ কিলোমিটার দূরে। তবে ২০১৭-র সহিংস আক্রমণের সময় গণমাধ্যমে মংডুতে একটি স্পেশাল ইকোনমিক জোন নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়ে রিপোর্ট আসে। এটি সংকটাপন্ন এলাকার ভেতর নির্মিত হবে বলে জানানো হয়। কিন্তু যথেষ্ট তথ্য না থাকায় এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাচ্ছে না। লি জোনস দেখান যে সাসেন যে প্রকল্পগুলোর দৃষ্টান্ত টেনে দাবি করছেন, এই বড় প্রকল্পগুলো রোহিঙ্গা নিধনের কারণ সেগুলোর পেছনে যথেষ্ট প্রমাণ নেই। (Jones, 2017) তিনি এর পেছনে আরো নিগুঢ় রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কারণ অনুসন্ধানে আগ্রহী। আর সেদিকে আলোকপাত করতে হলে মিয়ানমারের রাজনৈতিক ইতিহাস, জাতিগত দ্বন্দ্বের ইতিহাস, অর্থনৈতিক সংস্কারের ধারাবাহিকতা ইত্যাদির দিকে মনোযোগ দিতে হবে।

সাসকিয়া সাসেন ও লি জোনসের বিপরীতমুখী অবস্থানের মধ্য দিয়ে বোধগম্য হয় যে এই রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কারণগুলো সরলীকরণ করার কোনো সুযোগ নেই। অর্থাৎ রোহিঙ্গা নিধনকে কোনো একক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে ফেলে দেখা যাবে না। এখানে আমি তৃতীয় একটি চিন্তা কাঠামোকে উপস্থাপন করতে চাইছি। ১৯৪৮ সালের প্রতিটি সহিংস আক্রমণের সাথে প্রতিটি সরকারের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক স্বার্থের একটি যোগসাজশ রয়েছে। এই প্রবন্ধে আমি প্রাথমিকভাবে কিছুটা আলোচনাও করেছি যে এই অর্থনৈতিক স্বার্থ কিভাবে বিভিন্ন সরকারভেদে দৃশ্যমান হয়েছে। অর্থাৎ জাতিগত বিদ্বেষ যে কোনো সমাজে অবস্থান করতেই পারে। কিন্তু তার রূপ গণহত্যার পরিণতি পর্যন্ত বিস্তৃত হতে হলে আরো ব্যাখ্যার প্রয়োজন। ২০১৭-তে গণতান্ত্রিক সরকারের শাসনামলে সহিংসতার সাথে সামরিক শাসনামলের সহিংসতার তুলনা করলে দেখা যায়, উভয় ক্ষেত্রেই সামরিক বাহিনী এই নৃশংসতা চালিয়েছিল। কিন্তু ২০১০-এর পর আক্রমণে কট্টরপন্থী রাখাইনদের অংশগ্রহণ যখন দেখা যায় তখন এই আক্রমণের পেছনে জনসমর্থন অর্জন করতে কট্টরপন্থী বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদীরা মিথ্যা প্রচারণা অব্যাহত রাখে। অক্টোবর ২০১৩-তে অং সান সু চি বিবিসিকে দেয়া একটি সাক্ষাৎকারে বলেন :

2012 violence was not ethnic cleansing but the product of 'fear on both sides…it is not just on the part of Muslims but the Buddhists too. Muslims have been targeted but also Buddhists have been subject to violence.

গণতন্ত্রের আইকন সু চির মতো রাজনীতিবিদের মুখ থেকে যদি এ ধরনের মন্তব্য আসে তাহলে ধরে নেয়া যায়, সামরিক শক্তিই এখানে সফল ভূমিকা পালন করেছে। যদি গণতান্ত্রিক সরকারকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে গণহত্যার মতো অপরাধ করেও সহজেই জনগণের কাছে কালিমামুক্ত থাকা যায় এবং অর্থনৈতিক উদারতার নীতি প্রণয়ন করে নিজ দেশের মুষ্টিমেয় শাসক শ্রেণীর অবস্থান সুদৃঢ় করা যায় তাহলে সামরিক অভ্যুত্থানেরও প্রয়োজন পড়ে না, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম রেখেই অর্থনৈতিক শোষণ অব্যাহত রাখা যায়। মিয়ানমারের রাজনীতি স্পষ্টতই এখন সে পথেই হাঁটছে। আর তাই রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর নিপীড়নের ইতিহাস ও ভবিষ্যৎ বুঝতে হলে শুধু জাতিগত বিদ্বেষের ধারাবাহিকতা দিয়ে বুঝলে হবে না, জাতিগত বিদ্বেষকে কে কিভাবে কাজে লাগিয়ে একটি অঙ্কুরকেকে কার উদ্দেশ্যে একটি মহিরুহে পরিণত করেছে তা অনুধাবন করতে হবে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে এই সংকটটি জাতীয় রাজনীতির বাইরে গিয়েও এমন একটি বৈশ্বিক অবয়ব ধারণ করেছে, যা ১৯৭৮ সালের পরিস্থিতির সাথে আর তুলনাযোগ্য নেই। সত্তরের দশকের তুলনায় এখন উদার অর্থনৈতিক নীতি অনুসরণের কারণে এক দেশ অন্য দেশের ওপর পুঁজিপ্রবাহ, বাণিজ্য, সেবা প্রভৃতি খাতে এমন ওতপ্রোতভাবে নির্ভরশীল হয়ে গেছে যে প্রতিটি উন্নয়নশীল দেশকে যে কোনো নীতি গ্রহণে পূর্বের চেয়ে অনেক জটিল অঙ্ক কষতে হয়। রাজনীতিতে টিকে থাকার জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলো যখন জনগণের তথা প্রান্তিক জনগণের কাছে জবাবদিহি নিশ্চিত না করে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কাছে আনুগত্য প্রদর্শনের পথ বেছে নেয় তখন তাদের জনসমর্থন অর্জন করতে ধর্মীয় ও জাতিগত পরিচয় ব্যবহার করে বাহারি আত্মপ্রচারণা ও প্রোপাগান্ডার ওপরই ভরসা করতে দেখা যায়। নিজেদের ক্ষমতায় থাকার অপরিহার্যতা প্রমাণের জন্য সত্যিকার অর্থে জাতীয় স্বার্থরক্ষার নজির নয়, বরং নিরাপত্তাহীনতা, শত্রুর প্রতি ভীতি, ধর্মীয় বিদ্বেষ, উন্নয়ন প্রোপাগান্ডা ইত্যাদিকে ব্যবহার করতে দেখা যায়। তাই যুক্তরাষ্ট্র থেকে শুরু করে যুক্তরাজ্য, ভারত, রাশিয়া, বাংলাদেশসহ সব দেশেই জাতীয়তাবাদী চেতনার ওপর ভর করে রাজনীতি আবর্তিত হচ্ছে। মিয়ানমারও এর ব্যতিক্রম নয়। এর শিকার হচ্ছে বিভিন্ন জাতি-ধর্মের ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষ। আর তার মধ্যেও রোহিঙ্গারা হয়ে গেছে সেই নিগৃহীতদের মধ্যেও নিগৃহীত।

> নাইন-সিক্স-নাইন আন্দোলনের ক্ষেত্রে দেখেছি বৌদ্ধদের মালিকানাভুক্ত দোকান বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সাইনবোর্ডে নাইন-সিক্স-নাইন চিহ্ন ব্যবহার করে বৌদ্ধদের এইসব দোকানে কেনাকাটা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হতো। অন্যটি হলো মা-বা-থা আন্দোলন, যা শুরু হয়েছিল ২০১৪ সালে।

৭.

এখন প্রশ্ন আসতে পারে, রোহিঙ্গাদের পক্ষে সারা বিশ্বে অনেক মানুষের মধ্যেই সহানুভূতিশীল জনমত তৈরি হয়ে আছে। অনেক প্রোপাগান্ডা সত্ত্বেও সারা বিশ্বের মানুষ রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অপরাধের নিন্দা জানাচ্ছে। তবু মিয়ানমার কেন এই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠাকে আমলে নিচ্ছে না? ২০১২ সালের পর মিয়ানমারের বিদেশিদের সম্পর্কে ভীতি বিষয়টা আবার নতুন করে প্রাসঙ্গিক হয়। এটি সংকটের বৈশ্বিক দিকটির ওপর নতুনভাবে আলোকপাত করতে সাহায্য করে। আমরা জানি, ১৯৭৮ সালে ওআইসি মিয়ানমারের ওপর চাপ দেয় অপারেশন নাগা মিনের সময় পালিয়ে যাওয়া রোহিঙ্গাদের ফেরত নিতে। আবার ১৯৮৮ সালে যখন মিয়ানমারের গণতান্ত্রিক আন্দোলন চলছে তখন সেপ্টেম্বর মাসে যুক্তরাষ্ট্র মিয়ানমারের উপকূলে ৫টি ন্যাভাল শিপ পাঠায়। (page 266, Crouch, 2016) ১৯৭৮ সালে ইসলামি দেশগুলোর হস্তক্ষেপের সময় বিদেশি ভীতি যেভাবে কাজ করেছিল, ১৯৮৮ সালে

আমেরিকার হস্তক্ষেপের কারণে এই ভীতি আবার নতুনভাবে প্রকাশ পায়। সেই সময়ের পর থেকে সামরিক সরকার বিদেশি হস্তক্ষেপের ব্যাপারে বিভিন্নভাবে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করতে শুরু করে। সামরিক সরকারের জন্য রোহিঙ্গারা ছিল দেশে অবস্থানকারী শত্রু, আর এদিকে একটি বহিঃশত্রুর ছায়ার উপস্থিতিও দরকার ছিল। আবার লক্ষ করলে দেখা যাবে, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন যদিও মিয়ানমারের ওপর অর্থনৈতিক অবরোধ দিয়ে রেখেছিল, মিয়ানমারে সেইসব দেশের কোম্পানির বিনিয়োগ কিন্তু একেবারে বন্ধ ছিল না। তাই বলা যায়, এই ভীতিটা এমন একটি আনুমানিক ধারণাভিত্তিক ব্যাপার, যার উপস্থিতি কোনো কিছু দিয়েই ঠিক প্রমাণ করা যায় না, শুধুমাত্র কিছু অনুমাননির্ভর ধারণার প্রকাশ ছাড়া।

তবে কিছু ঘটনার মধ্য দিয়ে আমরা দেখি বিদেশি উপস্থিতি নানাভাবে মিয়ানমারের সরকার তথা জনগণের মধ্যে একটা প্রভাব ফেলেছে। একটি উদাহরণ হতে পারে, ২০০৮ সালে সাইক্লোন নার্গিসের পর উপকূলীয় অঞ্চলে বিদেশ থেকে যে ত্রাণ আসে মিয়ানমার তা রাখাইনে বিতরণ করতে অসম্মতি জানায়, যদিও পরে ত্রাণ গ্রহণ করে। এনজিওদের ওপর রোহিঙ্গাদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ নিয়ে, চিকিৎসাসেবা দেয়া নিয়ে নানা রকম বিধিনিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। ২০১২ সালের পর ডক্টরস উইদাউট বর্ডার বা এমএসএফের ওপর আক্রমণ হয়। ২০১২ সালে ওআইসি রাখাইনে অফিস খুলতে চাইলে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ করে আর তাই ওআইসি এই বাধার মুখে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। এ রকম অনেক ঘটনার নজির ধরে বহিঃশত্রু সম্পর্কে ধারণা জাতীয়তাবাদীদের মগজে বিদ্ধ হতে থাকে।

> চীন এরই মধ্যে ২.৪৫ বিলিয়ন ডলার খরচ করে রাখাইন থেকে চীনের ইউনান প্রদেশ পর্যন্ত একটি পাইপলাইন নির্মাণের জন্য বিনিয়োগ করেছে। সাসেন আরো বলেন যে মিলিটারি ১৯৯০-এর দশক থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র কৃষকদের জোরপূর্বক ভূমি দখল চালিয়ে আসছে।

এখানে আরেকটি বিষয়ও লক্ষণীয় যে রাখাইন বৌদ্ধরাও রোহিঙ্গাদের মতো একইভাবে পশ্চাৎপদ একটি অঞ্চলে বসবাস করে। বিদেশ থেকে রোহিঙ্গাদের জন্য যখন এত ত্রাণ আসে তখন দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত রাখাইন জনগোষ্ঠীর মধ্যে জাতিবিদ্বেষ নতুন করে চাড়া দিয়ে ওঠে। সব মিলে রোহিঙ্গাদের ওপর বিদ্বেষ উত্তর রাখাইনে যেভাবে ক্রিয়াশীল তার সাথে মিয়ানমারের অন্যান্য অঞ্চলে একইভাবে ক্রিয়াশীল নয়। আবার এদিকে সীমান্ত অঞ্চলে বসবাসরত কারেন, মন, শান, কাচিন ও অন্যান্য জনগোষ্ঠীর রোহিঙ্গাদের বিষয়ে অবস্থান কেন্দ্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ বামার জাতিগোষ্ঠীর বিদ্বেষের সাথেও তুলনীয় নয়। তবে নিষ্ঠুর হলেও এটাই সত্য যে মিয়ানমারের এমনকি নিপীড়িত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকেও ২০১২ বা ২০১৭ সালে মিয়ানমার সামরিক সরকার তথা কট্টরপন্থীদের দ্বারা সংঘটিত মানবাতাবিরোধী অপরাধের বিরুদ্ধে সেভাবে দাঁড়াতে দেখা যায়নি। সামরিক সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে, কঠোরভাবে দমন-পীড়নের শিকার হয়ে, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী একীভূত হয়ে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিসরে প্রতিরোধ করার অবস্থানেও নেই।

অনেকেই অং সান সু চিকে নিরুপায় হিসেবে প্রমাণ করতে তাঁর নীরবতার পেছনে সামরিক বাহিনীর খবরদারির অজুহাত দেখান। অং সান সু চিকে গণতন্ত্রের আইকন হিসেবে প্রতিষ্ঠার পেছনে যুক্তরাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। গণতন্ত্রের আইকনের বর্তমান অসহায়ত্বকে উপস্থাপনের পেছনেও তাই যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা আছে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করাও স্বাভাবিক। বিষয়টি এমন দাঁড়িয়েছে যে, গণতন্ত্রের মানসকন্যার ইমেজ ভাঙতে গেলেও অসুবিধা আবার অং সান সু চিকে জাতিগত বিদ্বেষের মানসকন্যা হিসেবে উপস্থাপন করতেও অসুবিধা। তার চাইতে অং সান সু চিকে অসহায় হিসেবে উপস্থাপন বরং সহজসাধ্য। সব দিক বিবেচনায় এটাই বলা যায় যে, রোহিঙ্গারা মিয়ানমারের নিগৃহীত জনগোষ্ঠীর মধ্যে নিগৃহীত থেকেই জীবন বাঁচানোর লড়াই করে আসছিল এতোদিন। এবং ২০১৭-র নৃশংসতার পর তাদের ফিরে যাবার সব রকম রাস্তাও বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। তাদের বাড়িঘর গাছ পুড়িয়ে, পোষ্য গরু ছাগল, জমি-পুকুর দখল করে, জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় সকল মৌলিক সম্পদ ধ্বংস করে, দখল করে, ধর্মীয় প্রার্থনাস্থান বিনাশ করে তাদেরকে নির্মমভাবে আশ্রয়হীন করে ফেলা হয়েছে।

৮.

গণহত্যা, মন্থর গণহত্যা, নাকি জাতিগত নিধন? রোহিঙ্গাদের ওপর নিপীড়ন কি গণহত্যা, নাকি জাতিগত নিধন তা নিয়ে আন্তর্জাতিক পরিসরে ব্যাপক পর্যালোচনা লক্ষ করা গেছে। গণহত্যা শব্দটি প্রথম আলোচনায় আসে ২০১৩ সালে আলজাজিরা টেলিভিশনে প্রচারিত Hidden Gnocide নামে একটি ডকুমেন্টারিতে দেয়া কিছু সাক্ষাৎকার থেকে। সেখানে রোহিঙ্গাদের ওপর নির্যাতন ও নিষ্পেষণকে গণহত্যার সাথে তুলনা করা হলে বিশ্বজুড়ে এ নিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন এর পর থেকে বিষয়টিকে আইনি কাঠামোয় ফেলে প্রশ্ন করা শুরু করে যে এই ঘটনাটিকে গণহত্যা বলা যাবে কি না। ১৯৫১ সাল থেকে সক্রিয় জাতিসংঘের একটি কনভেনশন, UN Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, অনুযায়ী গণহত্যার একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞা রয়েছে। এই কনভেনশনে জেনোসাইড বা গণহত্যার সংজ্ঞায় intent to destroy, in whole or in part বা 'পুরোপুরি বা আংশিকভাবে ধ্বংস করার অভিপ্রায়' একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে উলেখ করা হয়েছে। কনভেনশনের আর্টিকল ২ ও ৩ অনুসারে, কোনো জাতিগোষ্ঠীকে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করার অভিপ্রায়ে সংগঠিত যেসব কর্মকাণ্ড গণহত্যা বলে বিবেচিত এবং শাস্তিযোগ্য তার একটা তালিকা দেয়া আছে, যার মধ্যে রয়েছে হত্যা, মারাত্মক শারীরিক বা মানসিক ক্ষতিসাধন, উক্ত গোষ্ঠীকে নির্মূল করার লক্ষ্যে জোরপূর্বক জন্মবিরতিকরণ কিংবা ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর কাছে ওই গোষ্ঠীর শিশুদের হস্তান্তরের মতো নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা আরোপ। সরাসরি গণহত্যায় অংশগ্রহণ ছাড়াও গণহত্যার ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ, উস্কানি প্রদান, গণহত্যার উদ্যোগ গ্রহণ এবং তাতে সহযোগিতা করলেও কেউ গণহত্যায় দোষী সাব্যস্ত হতে পারে।

আজিম ইব্রাহীম তাঁর বইয়ে আরাকানে রোহিঙ্গাদের ওপর যে ধরনের নির্মম হত্যাকাণ্ড, বাড়িঘর পোড়ানো, জোরপূর্বক জন্মবিরতিকরণ, চলাচলের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ এবং শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে তাতে এই নিপীড়নকে গণহত্যা আখ্যা দেয়ার পূর্বশর্ত প্রতিষ্ঠা হয়েছে এমনভাবেই দেখতে চেয়েছেন। (Ibrahim, 2016)

২০১৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল ল স্কুল ফর্টিফাই রাইটস নামে একটি মানবাধিকার সংগঠনের সহায়তায় রাখাইনে রোহিঙ্গাদের প্রতি

নিপীড়নকে গণহত্যা বলা যায় কি না তা নিয়ে একটি পর্যালোচনা করে রিপোর্ট প্রকাশ করে। ৬৫ পাতার একটি দীর্ঘ পর্যালোচনা থেকে বেরিয়ে আসে যে এটিকে গণহত্যা বলা যায় :

This paper, therefore, finds strong evidence that the abuses against Rohingya satisfy the three elements of genocide: that Rohingya are a group as contemplated by the Genocide Convention; that genocidal acts have been committed against Rohingya; and that such acts have been committed with the intent to destroy the Rohingya in whole or in part.

এই রিপোর্ট আরো বলা হয়–

The Human Rights Council should adopt a resolution that mandates the commission of inquiry to conduct an urgent comprehensive, and independent investigation of the widespread and systematic abuses committed against Rohingya. (Yale Law School, 2015)

আবার কোনো কোনো মানবাধিকার সংগঠন, গবেষক, সাংবাদিক, লেখক এবং আইনবিদ এই নিপীড়নকে একটি দীর্ঘমেয়াদি মন্থর গণহত্যা বলেও দাবি করেছেন। এর মধ্যে মালয়েশিয়ায় একটি ও লন্ডনে একটি গণ-আদালত গঠন করে সেখানে মন্থর গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে বলে রায়ও দেয়া হয়েছে। তাদের মতে, রোহিঙ্গারা দীর্ঘদিন ধরেই নীরবে কাঠামোগতভাবে রাষ্ট্রহীন হয়ে রাষ্ট্রীয় সহিংসতার শিকার হয়ে আসছে। যার নিদর্শন দেখা যায় ১৯৭৮, ১৯৯০, ২০১২ ও ২০১৭-র হত্যা, লুণ্ঠন, বাড়িঘর পোড়ানো, শারীরিক, মানসিক নির্যাতন থেকে। এ ছাড়াও ১৯৯২ সাল থেকে সৃষ্ট নাসাকা বাহিনীর দ্বারা নিয়মিতভাবে শারীরিক, মানসিক নিপীড়নের শিকার হয়ে আসা রোহিঙ্গাদের যেমন রাজনৈতিক অধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছে, তেমনি তাদের শিক্ষা, চিকিৎসা, বিয়ে, চাকরি, নির্বিঘ্নে জীবিকা নির্বাহের অধিকার, সম্পত্তির মালিকানার অধিকার, সন্তান জন্মদানের অধিকারসহ আরো অনেক অধিকার হরণ করা হয়েছে। এই প্রতিটি কাজের জন্য যেমন রাষ্ট্রের দায় রয়েছে, তেমনি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী জাতীয়তাবাদীরা, যারা রোহিঙ্গা জাতিকে ধ্বংস করে দেয়ার আয়োজনে সরাসরি ও প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিয়েছে, তাদেরও দায় রয়েছে। রোহিঙ্গাদের জোরপূর্বক দেশ ছাড়তে বাধ্য করা, অবৈধ ঘোষণা করা আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯৬২ সাল থেকে শুরু হয়েছে। এবং বিভিন্ন সময় এর কৌশল পরিবর্তন হয়েছে। ২০১২ সালে যখন হত্যাযজ্ঞ হয়েছে তখন রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা যখন একে একে সহিংস ঘটনা ঘটিয়ে যাচ্ছিল তখন রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বাহিনী তাদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি, উপরন্তু তাদেরকে সহায়তা করতে দেখা গেছে। আহত মানুষদের চিকিৎসা, খাদ্য, বাসস্থান থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এমনকি বিদেশ থেকে ত্রাণ এলে তা-ও দেয়া হয়নি। এই সব কিছুর ফলেই একটি গোষ্ঠীকে দুর্বল করে তাদের ওপর সহিংস হয়ে মিয়ানমার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তাকে অনেকেই slow burning genocide বা মন্থর গণহত্যা বলে আখ্যায়িত করছেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন মং জার্নি ও প্রমুখ। (Zarni, 2014)

এদিকে মানবাধিকার সংগঠনগুলো যখন এই হত্যাযজ্ঞকে গণহত্যা হিসেবে মতামত দিচ্ছে তখন আমরা গণমাধ্যম থেকে জানতে পারি, জাতিসংঘ এই নিপীড়নকে দেখেছে জাতিগত নিধনের 'টেক্সট বুক' দৃষ্টান্ত হিসেবে–

In an address to the UN Human Rights Council in Geneva, Zeid Ra'ad Al Hussein denounced the `brutal security operation' against the Rohingya in Rakhine state, which he said was `clearly disproportionate' to insurgent attacks carried out last month. (Guardian, 11 September 2017)

২০১৭ সালের ১১ অক্টোবর প্রকাশিত জাতিসংঘের অফিস অব দ্য হাই কমিশনার অব হিউম্যান রাইটস একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। সেখানে বাংলাদেশে আসা রোহিঙ্গাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে একটি মতামত দেয়া হয়। সেখানে বলা হয়–

Brutal attacks against Rohingya in northern Rakhine State have been well-organised, coordinated and systematic, with the intent of not only driving the population out of Myanmar but preventing them from returning to their homes, a new UN report based on interviews conducted in Bangladesh has found. The report by a team from the UN Human Rights Office, who met with the newly arrived Rohingya in Cox's Bazar from 14 to 24 September 2017, states that human rights violations committed against the Rohingya population were carried out by Myanmar security forces often in concert with armed Rakhine Buddhist individuals. The report, released on Wednesday, is based on some 65 interviews with individuals and groups. It also highlights a strategy to `instil deep and widespread fear and trauma – physical, emotional and psychological' among the Rohingya population. (OHCHR, October 2017)

> সাসকিয়া সাসেন ও লি জোনসের বিপরীতমুখী অবস্থানের মধ্য দিয়ে বোধগম্য হয় যে এই রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কারণগুলো সরলীকরণ করার কোনো সুযোগ নেই। অর্থাৎ রোহিঙ্গা নিধনকে কোনো একক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে ফেলে দেখা যাবে না।

ওপরে গণহত্যা নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে আন্তর্জাতিক পরিসরে কী ধরনের জনমত তৈরি হচ্ছে তার কিছু দৃষ্টান্ত স্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। গণহত্যার সংজ্ঞায় intent to destroy শর্ত পূরণ নিয়ে আন্তর্জাতিক পরিসরে নানা ধরনের মত রয়েছে। এই প্রবন্ধে সেই বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে চলমান নৃশংসতাকে গণহত্যা হিসেবে অভিহিত করার গুরুত্বের দিকে নজর দিতে চেয়েছি। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক আদালতে এই গণহত্যার বিচারের ভবিষ্যৎ কী তার চাইতে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এই চলমান গণহত্যা ঠেকাতে কী কী করণীয় এবং গণহত্যা প্রমাণের পেছনের রাজনৈতিক কারণগুলোর দিকে আলোকপাত। গণহত্যার সংজ্ঞায় intent to destroy প্রমাণিত হোক বা না হোক, কার জন্য এই বিচার কৌশলগত দিক দিয়ে কঠিন বা সহজসাধ্য তা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ জনগণের কাছ থেকে এই ধরনের মানবতাবিরোধী অপরাধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, বিচারের আকাঙ্ক্ষার পক্ষে প্রচার অব্যাহত রাখার রাজনীতির। আন্তর্জাতিক পরিসরে বর্তমানে যে স্থিতাবস্থা তৈরি হয়েছে তাতে জনগণের পক্ষ থেকে গণহত্যা প্রশ্নে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়াটাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়ে আরো বিশদ আলোচনার দাবি রাখে। প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে এর গুরুত্বের ওপর আলোকপাত সম্ভব না হলেও বিষয়টি মনোযোগ দাবি করে।

৯.

এই প্রবন্ধটি শুরু হয়েছিল কয়েকটি প্রশ্ন দিয়ে। এর মধ্যে মূল দুটো

প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আরো অনেকগুলো প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। প্রথম প্রশ্নটির উত্তর খুঁজতে গিয়ে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে, রোহিঙ্গাদের ওপর নিপীড়নের কারণ কি শুধুই জাতিগত বিদ্বেষ, নাকি এর পেছনে রয়েছে সামরিক বাহিনীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ? এর উত্তর খুঁজতে হলে বার্মার ইতিহাস, সাম্প্রদায়িকতার ইতিহাস, রোহিঙ্গাদের জাতিগত পরিচয়, বার্মার রাজনৈতিক কাঠামোর ধীর পরিবর্তন, রোহিঙ্গাসহ সকল নিপীড়িত গোষ্ঠীর সামাজিক অবস্থান, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বঞ্চনার ইতিহাস, ইসলামের প্রসার, বিশ্বায়নের যুগে বার্মার অর্থনৈতিক নীতি ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গতি-প্রকৃতি, ভূ-রাজনীতি, আন্তর্জাতিক পরিসরে বার্মার অবস্থান, মানবাধিকার সংকট এবং বিশ্বব্যবস্থার সংকট–সবকিছু সম্পর্কে ধারণা অর্জন করে একটি গবেষণার প্রয়োজন। স্বল্প পরিসরে এ রকম একটি প্রবন্ধ কোনোভাবেই রোহিঙ্গা সংকটের পূর্ণাঙ্গ পরিস্থিতিকে ধারণ করতে সক্ষম নয়। তবু এই স্বল্প পরিসরে কিছু প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে একটি বিশেষণ তুলে ধরেছি। এই বিশেষণ পর্যাপ্ত নয়। এমন অনেক বিষয় ইতিহাসের পাতায় পাতায় রয়েছে, যা না লিখলে অনেক প্রশ্নের উত্তরই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। রোহিঙ্গারা গণহত্যার শিকার, নাকি জাতিগত নিধনের শিকার–এ নিয়ে সৃষ্ট বিতর্কে একটি বিষয় পরিলক্ষিত হয় যে দুটি আলাদাভাবে গঠিত গণ-আদালতের রায় বলছে, গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো অভিযোগ আনুষ্ঠানিকভাবে আন্তর্জাতিক আদালতে (International Criminal Court, ICC) সেভাবে আনা হয়নি।

উদ্যোগ নেয়া সম্ভব হতো তিনভাবে–আন্তর্জাতিক আদালত যদি নিজে উদ্যোগী হয়ে এর বিচার করত, অথবা মিয়ানমারের জনগণ উদ্যোগ নিত, অথবা একটি তৃতীয় দেশ উদ্যোগ নিত। একাত্তরে বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যাও আন্তর্জাতিক আদালত এখনও গ্রহণ করেনি, কিন্তু জনগণ ও গণ-আদালতের রায় অনুযায়ী একাত্তরে পাকিস্তান মিলিটারি পরিচালিত গণহত্যাকে আমরা গণহত্যাই বলি। একই রকম ভাবে রোহিঙ্গাদের ওপর নিপীড়নকেও এখন সারা পৃথিবীর মানুষ গণহত্যা বলা শুরু করেছে। কাজেই এর ভবিষ্যৎ কী তা-ও এখন বলা সম্ভব নয়। আন্তর্জাতিক আদালত রায় দেবে কি দেবে না তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই জঘন্য মানবতাবিরোধী অপরাধের শাস্তি না হলে ভবিষ্যতে এ রকম ঘটনা ঘটার আশঙ্কা বেড়ে যাবে। বাংলাদেশের মতো একটি রাষ্ট্রের পক্ষে গণহত্যার অভিযোগ তুলে বিচার চাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। কৌশলগত দিক থেকে রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে সমর্থন অর্জন করার পথ বংলাদেশের জন্য সহজ। কিন্তু তাই বলে গণহত্যা হয়েছে–এই দাবি থেকে সরে যাওয়াও হবে সংকটাপন্ন। তাই জনগণের দিক থেকে জোর দাবি তুলতে হবে–যদি এমনকি গণহত্যার সংকীর্ণ সংজ্ঞার ফাঁকফোকরের ফাঁদে পড়ে গণহত্যা প্রমাণিত না-ও হয়, এ ধরনের অপরাধের দ্রুত বিচার করার জন্য আন্তর্জাতিক আইন সংশোধন করতে হবে। এমনকি যদি জাতিগত নিধনও হয় তাহলে তার জন্যও শাস্তির বিধান থাকতে হবে। হাজার হাজার মানুষকে মেরে ফেলে, তাদের জীবন বিপন্ন করে অমানবিক অবস্থায় ফেলে দেয়ার পরও যদি 'ধ্বংসের অভিপ্রায়' প্রমাণের জন্য যথেষ্ট উপকরণ না থাকে তাহলে বুঝে নিতে হবে, আন্তর্জাতিক আদালত আসলে উদ্দেশ্যমূলকভাবে এই আইন নিপীড়কের পক্ষে ব্যবহার করতেই বেশি আগ্রহী। আর সেদিক থেকেই জনগণের দাবি জোরদারভাবে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রচার করতে হবে এবং এই দাবির পক্ষে জনমত তৈরি করতে হবে।

রোহিঙ্গারা মিয়ানমারের নিগৃহীত আরো অনেক জাতির মধ্যে আরো বেশি নিগৃহীত। তাদের বঞ্চনার ইতিহাস এক দিনে রচিত হয়নি। একটি দীর্ঘ বঞ্চনা ও নিপীড়নের মধ্য দিয়ে গিয়ে তারা মাথা তুলে দাঁড়ানোর ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। এই প্রবন্ধে কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা ও বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, শুধু জাতিগত বিদ্বেষ বা শুধু অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষার দিক থেকে জাতিগত নিধনের প্রশ্নটিকে বিশেষণ করলে হবে না, বরং জাতিগত বিদ্বেষ, ধর্মীয় বিদ্বেষ, বিদেশিদের প্রতি ভীতি, অর্থনৈতিক নীতি, রাজনীতি, সামাজিক পরিবর্তন–সবকিছুকে সামগ্রিক জায়গা থেকে দেখে বিশেষণ করতে হবে। তার ওপর ইসলামি জঙ্গিদের সাথে সম্পৃক্ততার খবর প্রচার করে জনমনে রোহিঙ্গাদের সম্পর্কে বিদ্বেষের তীব্রতা আরো বাড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। এ অবস্থায় বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে মানবাধিকারসচেতন জনগণ তাদের পাশে দাঁড়ানোর অভিপ্রায় থাকা সত্ত্বেও তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারছে না।

বিশ্ব একটি স্থিতাবস্থায় এসে উপনীত হয়েছে, যেখান থেকে জাতিগত পরিচয়ে বিভক্ত একেকটি দেশ নিজেদের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের উদ্দেশ্যের সাথে রোহিঙ্গাদের স্বার্থের সংঘাত থাকায় ঘৃণ্য মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটিত হওয়া সত্ত্বেও নীরব ভূমিকা পালন করছে। এর মধ্যে জাতিসংঘের রোহিঙ্গা বিষয়ক অধিবেশনে ভারত, চীন ও রাশিয়ার মতো দেশগুলো মিয়ানমারের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। ইউরোপীয় দেশগুলো, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে মন্তব্য করলেও অর্থপূর্ণভাবে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। এদিকে ইসলামি দেশগুলোর জোট ওআইসি মিয়ানমারের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে কোনো চাপ সৃষ্টি করতে পারছে না। পুঁজির প্রবাহ, ভূ-রাজনীতি, অর্থনৈতিক স্বার্থ এখানে রোহিঙ্গাদের ভবিষ্যৎকে কিভাবে নির্ধারণ করছে, রোহিঙ্গাদের মুক্তির লড়াইয়ে নিয়োজিত সংগঠন আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি (আরসা) ভবিষ্যতে কী ভূমিকা রাখবে, এবং কিভাবে বাংলাদেশের রাজনীতি রোহিঙ্গাদের দ্বারা প্রভাবিত হবে তা বুঝতে হলে এই বিষয়ে দীর্ঘ গবেষণা, বিশ্লেষণ ও সংলাপ চালিয়ে যেতে হবে।

মোশাহিদা সুলতানা: শিক্ষক, বাণিজ্য অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ইমেইল: moshahida@gmail.com

তথ্যসূত্র

Buchanan, F. (1799) `A Comparative Vocabulary of Some of the Languages Spoken in the Burma Empire'. Asiatic Researches 5 (1799): 219-240.

Chan, Aye (2005) SOAS Bulletin of Burma Research, Vol. 3, No. 2, Autumn 2005, ISSN 1479-8484

Crouch Melissa, (2016) Islam and the State in Myanmar, Oxford University Press 2016)

Coursen-Neff, Z. (2000) Malaysia/Burma Living in Limbo: Burmese Rohingyas in Malaysia. New York: Human Rights Watch. Crosthwaite, Sir Charles. 1912. The Pacification of Burma. London: Edward Arnold.

Green, P. (2013) Islamophobia: Burma's racist fault-line, Race and Class, Volume: 55 issue: 2, page(s): 93-98

Guardian (2017) Myanmar treatment of Rohingya looks like 'textbook ethnic cleansing', says UN

https://www.theguardian.com/world/2017/sep/11/un-myanmars-treatment-of-rohingya-textbook-example-of-ethnic-cleansing

Jones, Lee (2017) A better Political Economy of the Rohingya Crisis, New Mandala

Ibrahim, Azeem, (2016) The Rohingyas, Inside Myanmar's hidden genocide, C. Hurst and Company.

Lwin, Nay San (2012) `Making Rohingya Stateless' New Mandala. Available at http://asiapacific.anu.edu.au/newmandala/2012/10/29/making-rohingya-statelessness/.

Yale Law School, Allard K. Lowenstein International Human Rights Clinic (2015) Persecution of the Rohingya Muslims: Is Genocide Occurring in Myanmar's Rakhine State? A Legal Analysis. By support of Fortify Rights.

Nemoto, Kei (2013) The Rohingya Issue: A Thorny Obstacle between Burma and Bangladesh. Burma Library. Available at www.burmalibrary.org/docs14/Kei_Nemoto-Rohingya.pdf

Rakhine Commission Report, (2017) available at http://www.rakhinecommission.org/app/uploads/2017/08/FinalReport_Eng.pdf

Sassen, Saskia (2017) `When Religion is used by the Military to Justify Their Aims', The Daily Star, October 13, 2017

Scholnthal, Benjamin (2016) Making the Muslim other in Myanmar and Sri Lanka. In Islam and the State in Myanmar, Oxford University Press, New Delhi

OHCHR (2017) Mission report of OHCHR rapid response mission to Cox's Bazar, Bangladesh http://www.ohchr.org/Documents/Countries/MM/CXBMissionSummaryFindingsOctober2017.pdf (Accessed on October 13, 2017)

Wade Francis (2017) Myanmar's Enemy Within, ZED Books Ltd. London

Yegar Moshe (1972) The Muslims of Burma. Germany. Otto Harassowitz.

Zarni, Maung and Cowley, Alice (2014) The Slow Burning Genocide of Myanmar's Rohingya, Pacific Rim Law and Policy Journal Association, Vol 23 No. 3

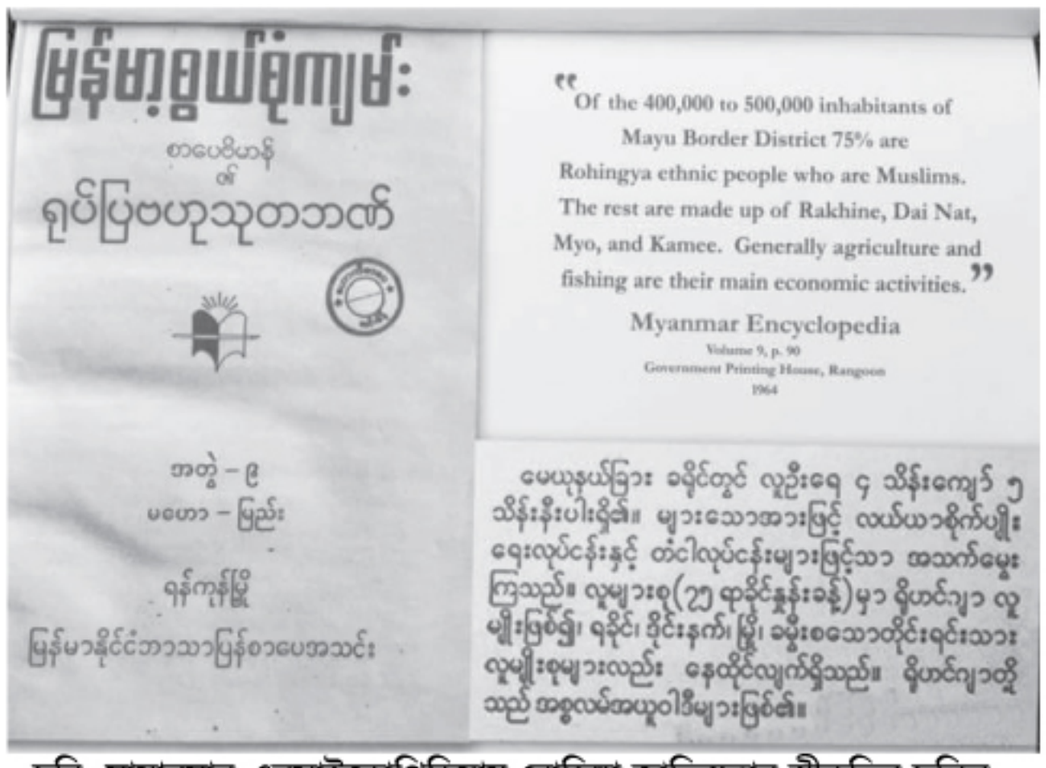

ছবি: মায়ানমার এনসাইক্লোপিডিয়ায় রোহিঙ্গা জাতিস্বত্ত্বার স্বীকৃতির দলিল
সূত্র: মং জার্নি ২০১৭ <http://www.maungzarni.net/>

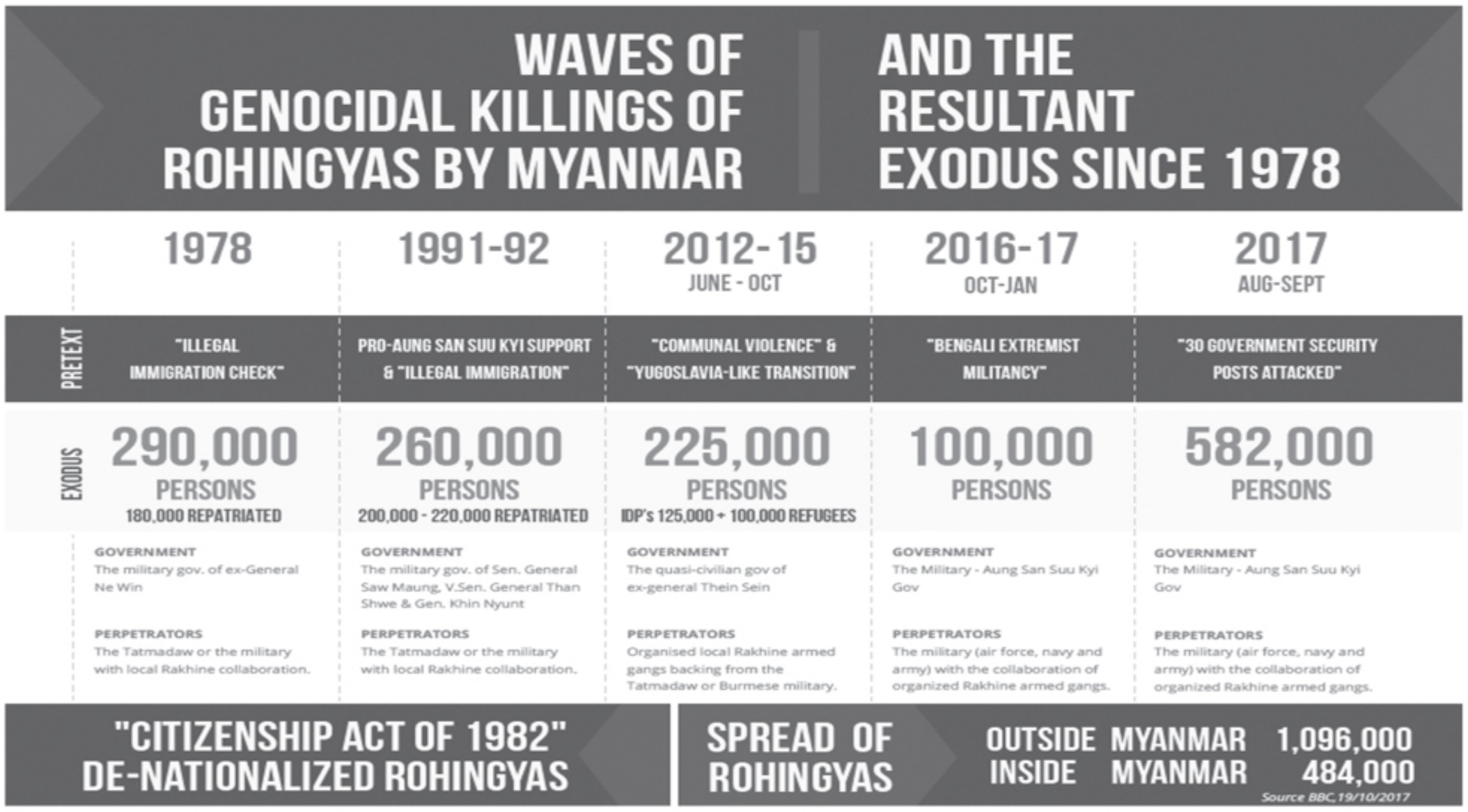

ছবি: মায়ানমারে রোহিঙ্গা নিপীড়নের টাইম লাইন
সূত্র: মং জার্নি ২০১৭ <http://www.maungzarni.net/>